মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

মার্চ - এপ্রিল ১৯৯৩

ঈদ সংখ্যা

ঈদের আনন্দ কি ও কেন

ভারত কি বাংলাদেশকে অঙ্গরাজ্য মনে করে?

আল্লাহর সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি

হিন্দু ধর্মের স্বরূপ সন্ধানে

উপন্যাসঃ মরণজয়ী মুজাহিদ

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতাঃ
শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৮ চৈত্র–১৩৯৯
৮ শাওয়াল–১৪১৩
১ এপ্রিল–১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ
কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ
মুফ্‌তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ
হাবিবুর রহমান খান
মুফ্‌তী শফিকুর রহমান

মূল্য ঃ ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
সম্পাদক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা–১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯
অথবা
জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা–১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম ২
* সম্পাদকীয় ৩
* ঈদের আনন্দ কি ও কেন?
  মোঃ মাকছুদ উল্লাহ্ ৫
* রমজান ইতেকাফ ও লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য ও আবেদন
  মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন ৭
* হিন্দুধর্মের স্বরূপ সন্ধানে
  মূলঃ শামস নবীদ ওছমানী ১১
* ইসলাম যাকাত বিধান
  মাওঃ নূর মুহাম্মাদ আজমী ১৬
* আমার দেশের চালচিত্র
  মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন খান ১৬
* মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?
  ইবনে বতুতা ২০
* ভারত কি বাংলাদেশকে অঙ্গরাজ্য মনে করে?
  আবদুল্লাহ আল ফারুক ২৩
* কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল
  আল্লাহ্‌র সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি ২৫
* হাকীমুল উম্মত থানুভীর (রাঃ) মনোনীত কাহিনী
  অনুবাদঃ ম· আ· মাহদী ২৮
* বাংগালী জাতি ও বাংলাভাষার প্রকৃতি ইতিহাস
  ফজলুল করীম যশোরী ৩০
* রুশ কয়েদীদের জবানবন্দীঃ আফগানিস্তানে আমরা কি দেখেছি
  মূলঃ সুলতান সিদ্দিকী ৩৩
* ধারাবাহিক উপন্যাস
  মরণজয়ী মুজাহিদ
  মল্লিক আহমাদ সরওয়ার ৩৪
* আমরা যাদের উত্তরসূরী
  মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী (রাঃ)
  মোঃ শফিকুল আমীন ৩৭
* কবিতা ৪০
* প্রশ্নোত্তর ৪১
* নবীন মুজাহিদদের পাতা ৪৪
* আপনার চিঠির জবাব ৪৫
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা ৪৬

পাঠকের কলাম

এর কোন তুলনা নেই

জনাব সম্পাদক সাহেব,

সালাম ও নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন। বর্তমান বিশ্বের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আপনার সম্পাদিত মাসিক "জাগো মুজাহিদ" অবশ্যই আমাদের সুপথের দিশারী। বর্তমান প্রায় ২০০ এর মত অশ্লীল, রুচীহীন ম্যাগাজিন বাজার সয়লাভ করে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে "জাগো মুজাহিদ" এর আত্মপ্রকাশ অবশ্যই আনন্দের সংবাদ। এ কাগজটি বাতিলের মুকাবিলায় শানিত তরবারীর মত কাজ করছে। বিশেষ করে প্রশ্নোত্তর বিভাগটিকে জাতি ধর্ম দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য নিঃসন্দেহে এক আলোক বর্তিকা এবং পথের পাথেয় বল্লে অত্যুক্তি হবে না। যদিও প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। এ ছাড়া বলতে পারো বিভাগটিও অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বহু ইসলামী বই ঘাটাঘাটি করতে হয়। যার ফলে সে অজানা অনেক তথ্যের সন্ধান পায়। সম্পাদকীয় অত্যন্ত ভালো লাগে। কারণ এতে সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং তার সমাধান পাওয়া যায়। এক কথায় এর প্রতিটি লেখা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। এই পত্রিকার কোন তুলনা হয় না। দীর্ঘদিন এমন একটি পত্রিকার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি "জাগো মুজাহিদের" দীর্ঘ জীবন, উন্নতি ও বহুল প্রচার কামনা করি। পরিশেষে মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা, আমাদের প্রেরণা হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকুক এই পত্রিকা।

কে, এম, এবাদুল হক (তুহিন)
আলিম প্রথম বর্ষ
মানবিক বিভাগ, রোল-৩
খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

প্রয়োজনীয়তা ও আবেদন অফুরান

মাসিক জাগো মুজাহিদের একজন নিয়মিত পাঠক হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মাসিক জাগো মুজাহিদ অন্যান্য যাবতীয় ইসলামী পত্রিকার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তথ্যবহুল পত্রিকা। একজন পাঠকের পক্ষে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত ঝিমিয়ে পড়া মানসিকতার চিকিৎসা এবং জিহাদী জযবায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ পত্রিকার কোন জুড়ি মিলে না। এ পত্রিকাটি অজানাকে জানার আগ্রহও অধিকতর বৃদ্ধি করে। এ পত্রিকা পড়ে আমি যত আনন্দ পাই তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। সত্যই আমি জাগো মুজাহিদ থেকে যা জানতে পারছি অন্য কোন পত্রিকা বা ম্যাগাজিন থেকে তা পাইনি। সমাজের সর্বস্তরের মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই মাসিক জাগো মুজাহিদ পাঠ করুন এবং অন্যকেও পাঠ করতে উৎসাহ দিন। নিশ্চয় উপকৃত হবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন মাসিক জাগো মুজাহিদ ও তার কলম সৈনিকদের দীর্ঘায়ু করেন। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই আমার মুনাজাত।

জাফর আহমাদ
দারুল উলুম কওমিয়া হাফেজিয়া সুফিয়া মাদ্রাসা,
বালুয়াহাট, সোনাতলা, বগুড়া।

যাত্রার গতি আরও বেগবান হোক

মুহতারাম,

জাগো মুজাহিদ আমার আশাহত হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেছে। নিভে যাওয়া সুদীপ্ত হৃদয় প্রদীপ আবার সপ্ত শিখায় জ্বলে উঠেছে। খোদাদ্রোহী পারিপার্শ্বিকতার বিষছোঁয়ায় ঝিমিয়ে পড়েছিলে যে যুব সমাজ এই বিপ্লবী মাসিকিটির পরশে সে যুব সমাজ যৌবন চাঞ্চল্য আবার ফিরে পাবেই। কেননা এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে বিপ্লবের আহবান, এর অন্তরনিহীত আবেদেন হৃদয়ে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, জাগিযে তুলে মুমিন হৃদয়ে শাহাদাতের আকাংখা। বহুদিন ধরে কত অসংখ্য তরুণের আশা উদ্দিপনা ও ভাষা থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করার যথার্থ কোন পথ ছিল না। আজ সে অভাব পুরণ করার লক্ষ্যে সময়ের সাহসী অংগিকার নিয়ে এবং আজকের তরুণ সমাজকে বিপ্লবের আহবান জানিয়ে জাগো মুজাহিদ তার আপন গতিতে এগিয় চলছে। চিরদিন অব্যাহত থাকুক বিপ্লবী মুখপত্র জাগো মুজাহিদের অগ্রাযাত্রা।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
লাকসাম, কুমিল্লা।

মুসলিম জাহান নামে একটি বিভাগ চাই

সুপ্রিয় সম্পাদক সাহেব! জাগো মুজাহিদ আমার সবচেয়ে প্রিয়, ভালো লাগার কাগজ। পত্রিকাটি আরও যেন ভালো লাগে সেজন্য চাই "মুসলিম জাহান" নামে নতুন একটি বিভাগ। আশা করি "মুসলিম জাহান" নামে একটি বিভাগ চালু করলে সকলের আরও উপকার হবে এবং আমরা পঠক সমাজ আরও একটি সুন্দর বিষয় সম্বন্ধে নিয়মিত জ্ঞান পাব। আমি মনে করি, বিষয়টি পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার আবেদনটিসুবিবেচনারঅনুরোধরইল।

মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক (মাহ্‌ফুক)
গ্রামঃ ও থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ,
জেলাঃগাইবান্ধা।

আপনাদের পাঠানো গতসংখ্যার মাসিক জাগো মুজাহিদের সৌজন্য কপিটি পেয়ে খুটে খুটে সব কিছু পাঠ করলাম। সত্যিই পত্রিকাটি যে এ জ্ঞানগর্ভপূর্ণ আগে তা ভাবতেও পারিনি। বিশেষ করে হোয়াইট হাউসের নেতৃত্ব বদল নিয়ে লেখা সম্পাদকীয় বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে থাকবে। সম্পাদকীয়টি আমি আমার বিশেষ এক প্রতিবেশীকে পাঠ করতে দেই যিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের বিদ্বেষী। এটি পাঠ করার পরে থেকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেন। ইতি মধ্যেই তিনি তাঁর অনেক সহকর্মী নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

মুফতী শফিকুর রহমান অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তিনি কাদিয়ানীদের বিষয়ে যে তথ্য তুলে ধরছেন তা আমাদের দীর্ঘ দিনের ব্যক্তি জিজ্ঞাসারজওয়াব। কাদিয়ানীদের ন্যায় আরো কোন ভ্রান্ত দল থাকলে তাদের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য মুফতি শফিকুর রহমানের প্রতি রাইল আমাদের আকুল আবেদন।

অনেকগুলো পত্রিকার সাথে আমি সম্পৃক্ত। এর মধ্যে মাসিক জাগো মুজাহিদ সত্যিই একটি ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকা। এর প্রতিটি কলাম ভালো লেগেছে। প্রচুর প্রেরণা যুগিয়েছে আমাকে। পত্রিকা জগতে প্রশ্নোত্তর সহ যতগুলো পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ করে মাসিক জাগো মুজাহিদ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। পরম মহিয়ান প্রভুর দরবারে আমার মুনাজাত, হে খোদা! তুমি এমন একটি পত্রিকাকে দীর্ঘস্থায়ী কর এবং এর মাধ্যমে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়া মুসলিম সমাজকে মুক্তির সুপথ দেখাও।

মাঃ মোঃ লিয়াকত আলী
নয়াপাড়া, ভদ্রঘাট,
সিরাজগঞ্জ।

সম্পাদকীয়

ঈদ মোবারক

মুসলিম উম্মাহর গোটা অস্তিত্বের উপর রহমত ও বরকতের সুশীতল ছায়া বিস্তার সমাপ্ত করে পবিত্র মাহে রমযান এখন তার পসরা গুটিয়ে ফেলেছে। রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম হতে মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছিলো কুরআন নাযিলের মাস। সক্ষম মুসলমানদের জন্য পানাহার ও জৈব সম্ভোগ পরিহার করে এ দিবসগুলো অতিক্রম করা ছিল ফরয। ইসলামের অন্যতম রুকন 'সিয়াম' পালনের পাশাপাশি মু'মিন বান্দারা এর রজনীগুলোতে করেছেন তারাবীহ নামাজের পবিত্র সাধনা। ঈমান, ইহতেসাব, আত্মবিশ্লেষণ বা সচেতনা সহযোগে যারা রোজা ও তারাবীহ আদায়ের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের অতীত–ভবিষ্যতের গোনাহ মাফ করা হয়ে গেছে। আর রোযার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর আপন ইচ্ছামত প্রদান করবেন বলে যে ওয়াদা দিয়েছেন সে আশায় বুক বেঁধে ঈমানদারেরা জীবনের অনাগত দিনগুলো ইসলামের আলোকে বিন্যস্ত করার সাধনায় ব্যাস্ত।

একটি মাসের অসাধারণ জীবন যাপন ও শরীয়ত নির্দেশিত সংযম পালনের পর আল্লাহ্র অনুগত বান্দারা তাদের আমলের প্রতিদান ও ক্ষমার ঘোষণা পাওয়ার লক্ষ্যে সমবেত হয় ঈদগাহে। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষণা আসেঃ ক্ষমা করে দেয়া হলো, তোমরা পাপমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। রোযা ছেড়ে দেয়ার খুশী অর্থই ঈদুল ফিত্র। পবিত্র রমযানে যে সব ভাগ্যবান আল্লাহ্ পাকের হুকুম মোতাবেক আত্মসংশোধন ও খোদাভীতি অর্জনের সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের জন্যই প্রকৃত ঈদের আনন্দ। তবে ঈদের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে সবার জন্য। ইসলামের শান্তি সম্প্রীতি, সৌন্দর্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সওগাত গোটা মানব বিশ্বের জন্য অবারিত।

সুখকর ঐক্য তবে শংকামুক্ত নয়

মাহে রমযানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় ছিল আফগান মুজাহিদদের সবগুলো গ্রুপের সমঝোতা। গত বছর এপ্রিলে কাবুল মুক্ত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সাবেক কমিউনিস্ট সেনা বাহিনী স্বাধীন দেশে ঘাপটি মেরে থাকা সমাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে অনেক অশান্তি, অনেক রক্তক্ষয় হয়ে গেছে। সাবেক সরকারের অনুগত কমিউনিস্ট জেনালের আবদুর রশীদ দোস্তামের মিলিশিয়া বাহিনী আর ক্ষমতাসীন মুজাহিদ নেতাদের সামরিক শক্তির সমন্বয়ে তৈরী জগাখিচুরী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে একটি গ্রুপের অব্যাহত লড়াই বহুবার চেষ্টা করেও থামানো যায়নি। কিন্তু এবারকার শান্তি চুক্তি অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী ফলপ্রসু হবে বলে বিশ্ব রাজনীতির পর্যবেক্ষকগণ মনে করছেন।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন জমিয়তে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক বুরহানুদ্দীন রাব্বানীর ক্ষমতা গ্রহণ থেকেই মূলতঃ অশান্তির শুরু। দোস্তম মিলিশিয়াকে কাবুল থেকে প্রত্যাহার, অনতিবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন ও আফগানিস্তানে বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্দলীয় সরকার কায়েমের দাবী নিয়ে সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হিজবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ার এবারের শান্তি আলোচনায় শরীক হওয়ায় এবারকার শান্তি চুক্তি স্থায়ী হবে বলে আমাদের ধারণা। মুজাহিদদের বিগত শুরার মিটিংয়ে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন না পেলেও রাব্বানীকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার মাধ্যমে অশান্তি আরো ঘনীভূত হয়েছিল। হিজবে ইসলামীর অব্যাহত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলেই আফগান সরকার তার মৌলিক ত্রুটিগুলো শুধরে নেয়ার পথে এগিয়েছে। সউদী আরব ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও অবশেষে হিজবে ইসলামীর ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েই শান্তি চুক্তির দফা সমূহ তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে।

বিতর্কিত নির্বাচনের ফলে অধ্যাপক রাব্বানীর রাষ্ট্রপ্রধান থাকার সময়সীমা আগামী ১৮ মাস সময়ের জন্য বেঁধে দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙ্গে দিয়ে এ জায়গায় সম্মিলিত মুজাহিদ প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ এ কাউন্সিলের প্রধান হবেন না বলেও চুক্তিতে শর্ত রাখা হয়েছে। চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর সউদী আরবের বাদশাহ ফাহাদের দাওয়াতে মুজাহিদ নেতারা পবিত্র মক্কা শরীফে গিয়ে উমরাহ পালন করেন। পাকিস্তানে বসে গৃহীত শান্তি চুক্তিটির পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সউদী আরবে এটির উপর পুনরায় ঐকমত্য পোষণ করে নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী এবং নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে দস্তখত দেন সউদী বাদশাহ ও পাক প্রধানমন্ত্রী। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ কাবুলে ফিরে এসে এখন প্রশাসনকে ঢেলে সাজাচ্ছেন। সকল গ্রুপের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হচ্ছে নয়া মন্ত্রীসভা। শান্তি ও ঐক্যের একটা সুন্দর পরিবেশে আফগানিস্তান শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এটাই হোক আজকের কামনা।

একটা আশংকার কথা এখানে উল্লেখ না করলে বিষয়টা পূর্ণ হয় না। পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা শুরুর পর মাঝে একটা শুক্রবার পড়েছিল। এইদিন আলোচনা স্থগিত থাকায় হিকমতইয়ার গিয়েছিলেন তার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হতে পেশোয়ারস্থ মুজাহিদ পল্লীতে। রাব্বানী ছিলেন ইসলামাবাদের রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। এ দিনই কাবুলে রকেট হামলায় বহু লোক হতাহত হয়েছে। পর দিন উভয় নেতা বলেছেন যে, এ হামলার সাথে আমাদের কোন মুজাহিদ জড়িত নয়। শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়ায় নেতাদের রেখে কোনো মুজাহিদের পক্ষেই গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয়। অথচ গোটা বিশ্বের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলোর অধিকাংশই যে সংবাদটি প্রচার করলোঃ "শান্তি আলোচনা ব্যর্থঃ কাবুলে আবার যুদ্ধ"।

অভিজ্ঞ মহল আশংকা করেছেন যে, মুজাহিদ গ্রুপগুলোর অজ্ঞাতেও যদি যুদ্ধ চলতে পারে তাহলে নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হলেই কি আর অশান্তি বন্ধ করা সম্ভব? সাবেক কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী ও দেশদ্রোহী বিশৃংখলবাদীদের উস্কে দেয়ার আগুন যদি না নেভানো যায় তবে সকল মুজাহিদের অজ্ঞাতেই আবার প্রচণ্ড লড়াই শুরু হওয়ার আশংকা অমূলক নয়। তাছাড়া শান্তি আলোচনার মধ্যেই হিযবে ওয়াহ্দাত নামক ইরান সমর্থিত শিয়া গ্রুপটিও কাবুলে গোলাবর্ষন করে একটি খারাপ নজীর ইতিমধ্যে স্থাপন করে ফেলেছে। অতএব পবিত্র রমযানে, ঈদের প্রক্কালে, আফগান শান্তি চুক্তি যেমন উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য স্বস্তির সংবাদ ঠিক তেমনি আস্তিনে লুকিয়ে থাকা কাল সাপের বিষাক্ত ছোবলের আশংকা উদ্বেগের কারণ বটে। অতএব কাণ্ডারী হুশিয়ার।

'জাগো মুজাহিদ'—এর নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

২. বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিষ্ট্রি ডাক)

বাংলাদেশ	একশো চল্লিশ টাকা
ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
পাকিস্তান	আট ডলার
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার

সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়।

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মজাহিদ
বি-৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

ঈদের আনন্দ কি ও কেন

মোঃ মাকসুদ উল্লাহ

শ্রমের প্রতিদান শ্রমদাতার মনে এক অনাবিল সুখ-আনন্দ বয়ে আনে। সে আনন্দের সাথে কোন আনন্দেরই জুড়ি মিলে না। সে পরম আনন্দ লাভের পূর্বশর্ত শ্রম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বটি যথারীতি সম্পাদিত হবার পরবর্তী মুহূর্তটিও দায়িত্ব পালনকারীর জন্যে কম আনন্দের বিষয় নয়। রমযানের দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে ঈদের আনন্দটিও অনুরূপ। এটা যদিও রমযানের কৃচ্ছ সাধনাকারীর পুরস্কার প্রাপ্তির দিন নয় তবে তা পুরস্কার প্রাপ্তির পথে অনেক দূর অনুগমন। তেমনি অনেকটা নিশ্চয়তার আশ্বাস বৈ কি। একে সদ্য পরীক্ষা সমাপ্তকারী কোন ছাত্র-ছাত্রীর আনন্দের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যে পরীক্ষার সুফল প্রাপ্তি এবং সে সুফলের সনদ দ্বারা জীবনমান উন্নতকারী উপযুক্ত পেশা লাভের আনন্দ ছাড়াও তার পরীক্ষা সমাপ্তির পরবর্তী মুহূর্তটিও তার জন্যে অশেষ আনন্দ বয়ে আনে। তবে এক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, বৈষয়িক পরীক্ষাদাতা পরীক্ষায় ভালো করলে যেমন তার পাশ অবধারিত একজন রোযাদারের পরীক্ষা পাশের সুফল অবধারিত হলেও সেটি শর্তহীন নয়। অর্থাৎ জীবনের পরবর্তী দিনগুলোর বিভিন্ন পরীক্ষার স্তরগুলোও তাকে সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে যেতে হবে। কেননা ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক জগতের পরীক্ষা সমাপ্তির মেয়াদ নির্ধারিত থাকে বিধায় তার ফলাফল শর্তাধীন করা বা ঝুলিয়ে রাখার কোন নিয়ম নেই, কিন্তু একজন রোযাদারের পরীক্ষা সমাপ্তির দিন শুধু রমযানের শেষ তারিখই নয় বরং তার পার্থিব জীবনের সর্বশেষ দিনটিই হচ্ছে তার পরীক্ষার সর্বশেষ তারিখ। সুতরাং রমযানের সিয়াম পরীক্ষায় সফল উত্তরণ একজন রোযাদারের জন্য আনন্দ বয়ে আনলেও তার প্রকৃত আনন্দ মূলতঃ সেদিনই নিশ্চিত হতে পারে, জীবনের পরবর্তী বিভিন্ন ধাপে যদি সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়। রোযা পালনের উদ্দেশ্যেও তাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ঈমাদারগণ রোযা পালনের বিধানকে তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হল যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, এজন্যে যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে"। (বাক্বারাহঃ ১৮৩) আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় চরিত্র ও জীবন ধারা আত্মস্থ করার প্রশ্নে রোযার সাধনা বিরাট সহায়কের কাজ করে। রমযানের সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষকে ক্ষুৎ পিপাসায় কষ্ট দিয়ে তার থেকে একটা ইবাদত আদায় করে নেয়াই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়। বরং যাতে তার জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে রমযানের অনুশীলন ও সাধানালব্ধ অভ্যাস দ্বারা সে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যে অটল ভূমিকা পালন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই তার প্রতিটি রোযা ফরজ করা হয়। কারণ এ বৈষয়িক জগতের দুঃখ-কষ্টের ভয় এবং ভোগের লালসা এদুটি বিষয় দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ দু'টি ক্ষেত্রে এসেই মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা লংঘন করে বসে। রমযানের প্রশিক্ষণ সে সীমালংঘন প্রবণতা হতে বিরত হবার ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করে।

বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর মানব সমাজে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনে যেরূপ নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তার আবশ্যক রমযানের সাধনা সে চারিত্রিক দৃঢ়তাই একজন রোযাদারের মধ্যে সৃষ্টি করে। সুতরাং রোযার অন্য লক্ষ যে, মুলতঃ রমযান শেষের পরবর্তী পার্যায়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে খোদায়ী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার দুরুহ দায়িত্ব পালনকে সহজ করে সে ব্যাপারে অধিক বলার অপেক্ষা রাখেনা। বস্তুতঃ এ দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা পালনকারী এবং ঈদ উৎসবে যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে মহা নবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন, "আজকের এদিন মুমিনের জন্যে যেমনি ঈদের দিন, তেমনি আল্লাহ্‌র অবাধ্যদের জন্যে ওয়ায়ীদের তথা হুমকির দিন।"

সারা রমযানের রোযা পালনের পর কেউ ঈদের খুশীর মধ্য দিয়ে পালনের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেলে এবং পুনঃরায় গতানুগতিক জীবনের অনুসারী হলে আর রোযা পালনকে নিষ্ফলই ধরে নিতে হবে। হাদীসেও তাই প্রমাণ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ " বহু রোযাদার এমন আছে যাদের রোযা দ্বারা অভুক্ত থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয়না এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী (নামায আদায়কারী) এমন আছে যাদের রাত্রিজাগরণ দ্বারা বিনিদ্র থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না। (নাসাযী, ইবনে মাজা।

সুখ ও দুঃখের কোন মুহূর্তেই মুসলমান আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকতে পারে না। তাই ঈদের আনন্দঘন মুহূর্তটিতেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। অন্যান্য জাতির নিছক বৈষয়িক আনন্দ অনুষ্ঠানের ন্যায় ঈদ অনুষ্ঠান পালিত হয় না। বরং তাতে আল্লাহ্‌র কাছে নতজানু এবং অবনত মস্তকে কাকুতি মিনতি সহকারে প্রার্থনা জানাতে হয়। আর

স্তুতি ও প্রশস্তি বর্ণনা করতে হয়। রাব্বুল আলামীনের কাছে রোযা সহ প্রতিটি ইবাদত-বন্দেগী অনুমোদনে এবং অপরাধ-সমূহ ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করতে হয়।

ঈদ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সার্বজনীন আনন্দ উৎসব। কেউ কেউ নামায পড়েনা, বহু লোক রোযা রাখেনা, অনেকে হজ্জব্রত পালনে অক্ষম, অনেকে আবার যাকাত আদায়ে অসমর্থ কিন্তু ঈদের আনন্দ সবার জন্যে সমান উপভোগ্য। কেউ আনন্দ করবে আর কেউ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে মুখ বেজার করে থাকবে ইসলাম সমাজের এ দৃশ্য দেখতে চায় না। বস্তুতঃ প্রকৃত ইসলামী সমাজের ঐ পীড়াদায়ক দৃশ্যের সৃষ্টি হবার কথাও নয়। এ জণ্যে খুশীর আনন্দকে সমভাবে সকলের উপভোগ্য করার উদ্দেশ্যে সামর্থহীন প্রতিটি মানুষের হাতে যাকাত, ছদকা ও দানের অর্থ তুলে দেয়ার জন্যে ইসলামে বিত্তাবানদের নির্দেশ দিয়েছে। এই পর্যায়ে একটি হাদীসের বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য, অর্থাৎ রসূল-ল্লাহ (সাঃ) প্রতি একজনের পক্ষ থেকে এক "সা" (অর্থাৎ এক সের সাড়ে বারো ছটাক) পরিমাণ খেজুর বা আটা (প্রত্যেক অঞ্চলের প্রাধান খাদ্য) দ্বারা ছদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন এবং মানুষ ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দরিদ্রের প্রতি বিত্তবানের এ দান মোটেই অনুগ্রহ বা করুণা নয়। বরং ধনী গরীবকে অর্থদান করে মূলতঃ গরীবের অধিকারকেই তার হাতে তুলে দেয়। পবিত্র কুরআনে অনুরূপ বলা হয়েছেঃ "এবং তাদের (ধনীদের) সম্পত্তিতে সাহায্যপ্রার্থী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা জারিয়াতঃ ১৯)

ঈদের এই আনন্দের মধ্যে দিয়েও আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার থেকে তার রাহে অর্থ ব্যয়ের পরীক্ষা নিচ্ছেন। পুরো রমযানের কৃচ্ছ সাধনায় মানুষ সাম্য, মৈত্রী, সহানুভূতি ও আন্তরিক প্রশস্ততার যে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ঈদের দিনে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবল-দুর্লল, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে পাশাপাশি এই জামাতে দাড়িয়ে একই ইমামের পেছনে নামাজ আদায়ের চোখ জুড়ানো পবিত্র দৃশ্য আর পরস্পর খাবার বিনিময় ও দরিদ্র অক্ষমদের খোঁজ খবর নেয়ার মধ্য দিয়ে সে প্রশিক্ষণেরই ফলশ্রুতি ফুটে ওঠে। তবে সেটা কেবল আনুষ্ঠানিক ও লোক দেখানো না হোক বরং স্থায়ী হোক, অন্তরনিঃসৃত হোক এটাই ইসলামের আদর্শ।

বস্তুতঃ এমনি মধুর পরিবেশটি সমাজে স্থায়ী করাই হচ্ছে ইসলামের চরম ও পরম লক্ষ। কিন্তু তা স্থায়ী হচ্ছে না। স্থায়ী থাকে না। আমাদের ঈদের দিনের কোলাকুলি, করমর্দনে প্রাণের উষ্ণতার অভাবই বোধ হয় এজন্যে দায়ী।

অন্যান্য সম্মিলিত ইবাদতের যে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, জামাতে ঈদের নামাজ আদায়ের পেছনেও সে একই মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয়। ঈদের জামাতে পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল শ্রেণীর মুসলমান উপস্থিত হয়। এ মহৎ পর্বে প্রত্যেকের পারস্পরিক মেলামেশা সম্প্রীতি মুসলিম জাতীয় ঐক্যের বিরাট সহায়ক। এসব জামাত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে পরিপুর্ণ ইসলামী আদর্শ অনুসরণের আহাবান জানানোর বিরাট সুযোগ এনে দেয়। মুসলিম সমাজ আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। নিজেদের ও অপর ভাইদের প্রতিটি সমস্যা ও জটিলতার গোড়ায় অনৈক্য ও অনৈতিকতার প্রাধান্য অধিক। মুসলমানদের প্রথম কেবলা আজও ইহুদীদের কবলে বরং তার উপর ইহুদীদের স্থায়ী দখল কায়েমের চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত।

বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্যে ইসলামের দুশমনরা ভিতর-বাইর উভয় দিক থেকে পাগল হয়ে লেগেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কাশ্মীর ও ফিলিস্তীনে ইসলামের দুশমনরা ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরতা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস ও কোণ-ঠাসা করার পাঁয়তারা চলছে। ঐক্যের অভাব এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ ছাড়া অনৈক্য এবং যাবতীয় দুর্বলতা ও অনৈতিকতা দূরিভূত করার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মিল্লাতের অবণতির কারণ সমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের সচেতন করা এবং আল্লাহ্--রাসূলের নির্দেশিত পথে এ সমস্যার সমাধান জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ঈদ-সমাবেশসমূহ বিরাট মাধ্যম। অবশ্য নানা মত ও পথের মানুষদের এই খুশীর অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় পেশ করা আবশ্যক বৈকি।

আমাদের ঈদের দিনের খুশীকে সকল স্তরের মানুষের মনে সমভাবে বিতরণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির অনুভূতি সৃষ্টি সহায়ক করার জন্য সকল দায়িত্বশীলদের আন্তরিক ভাবে সচেষ্টা হওয়া কর্তব্য।

ভুল সংশোধনঃ

'মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়' নিবন্ধের গত সংখ্যায় মাইকেল আফলাকের বাথ পার্টির মূল চালিকা শক্তি ও সদস্যদের 'দরজী' ও 'উলুবী' এই দুই শিয়া সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত দরজীর স্থানে 'দ্রুজ' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

—লেখক

রমযান্ ইতেকাফ ও লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য ও আবেদন

মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) এক শাবানের শেষ দিবসে জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর খুতবায় বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমাদের সম্মুখে এমন একটি মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র ও বরকতময় মাস সমাগত যার একটি রজনী (শবে কদর) হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই মাসে আল্লাহ্ তা'আলা রোযা ফরজ করেছেন এবং রাত্রিকালে মহান আল্লাহ্র দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে নফল ইবাদতের বিধান দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সেই মাসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য সুন্নত বা নফল ইবাদত পালন করে, বিনিময়ে তাকে অন্য সময়ের ফরজের সমান সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে একটি ফরজ আদায় করবে তাকে দেয়া হবে সত্তরটি ফরজের সমান সাওয়াব।

রমযান ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সমবেদনা ও সহমর্মীতার মাস। ধৈর্য্য বা সবরের বিনিময় হলো জান্নাত। এই মাসে ঈমানদারের জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুসিষ্ট ও সাওয়াব লাভের আশায় কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তাঁর (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং দোজখের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। উপরন্তু তাকে রোযাদার ব্যক্তির পূর্ণ সাওয়াব দেয়া হবে কিন্তু রোযাদারের সাওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রত্যেকের তো অন্যকে ইফতার করাবার সামর্থ নেই। তাহলে কি গরীব যারা তারা এমন সাওয়াব থেকে মাহরূম থাকবে? উত্তরে রসূলে করীম (স) বললেনঃ এই সাওয়াব আল্লাহ্ তায়ালা তাকেও দিবেন যে কিঞ্চিত দুধ কিংবা সামান্য পানি দ্বারা কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে। (এতটুকু সামর্থওকি কারো নেই?) অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তির সাথে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ্ তাকে আমার কাওসার দ্বারা এমন ভাবে তৃপ্ত করাবেন যে, বেহেশতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তার আর পিপাসা অনুভূত হবে না।

এই পবিত্র মাসের প্রথমাংশ রহমত, মধ্যমাংশ মাগফেরাত ও শেষাংশ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ। যে ব্যক্তি এই মাসে ক্রীতদাস ও শ্রমিক-মজুরদের শ্রম লাঘব করে দিবে; আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোজখ থেকে মুক্তি দিবেন। (বায়হাকী)

উল্লেখ্য যে, রমযান মাসকে মহাননবী (স) ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সমবেদনা ও সহমর্মীতার মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় "সবর" বা ধৈর্য্য বলা হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রবৃত্তি দমন করে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট হলেও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীকে যথাযথভাবে পালন করাকে। রমযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রোযায় সবর বা ধৈর্য্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। রোযা রেখে রোযাদার হাড়ে হাড়ে টের পায় যে, দারিদ্র আর ক্ষুধার জ্বালা কাকে বলে। এতে গরীব মিসমীনদের প্রতি খাঁটি রোযাদারদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

রমযান মাসে ঈমানদারদের রুজি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তাই দেখা যায় যে, রমযান মাসে রেমাযাদারগণ অন্য মাসের তুলনায় স্বচ্ছলতার সাথে উত্তমভাবে পানাহার করে থাকে। বস্তুতঃ এই বস্তু জগতে মানুষ যে ভাবেই যা লাভ করুক তা আল্লাহ্র ফয়সালায়-ই হয়ে থাকে।

তিন শ্রেণীর লোক রমযানের ফজীলত ও বরকত লাভ করে উপকৃত হবেন। প্রথমতঃ যারা নেক ও সৎকর্মশীল এবং সর্বদা তাকওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। রমযানের প্রথমাংশ এদের জন্য রমহত। প্রথম দিন থেকেই এদের উপর আল্লাহ্র রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে শুরু হয়।

দ্বিতীয়তঃ যারা এই পর্যায়ের পরহেযগার বা মুত্তাকী নন বটে-কিন্তু প্রথম শ্রেণীর তুলনায় খুব মন্দও নন। এ ধরণের লোকদের জন্য রমযানের মধ্যমাংশ হলো মাগফেরাত। প্রথম দশদিন এরা বিভিন্ন আমল ও তাওবা এস্তেগফার দ্বারা নিজেদের অবস্তার উন্নতি সাধন করে এবং নিজদেরকে মাগফিরাতের বা ক্ষমার উপযুক্ত করে তুলোন। অতঃপর রমযানের মধ্যমাংশে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমার ফয়সালা করে দেন।

তৃতীয়তঃ যারা নিজেদের উপর সীমাহীন জুলুম করেছেন এবং বদ আমলের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছেন। রমযানের শেষাংশ তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির বারতা বয়ে আনে। প্রথম ও মধ্যমাংশে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে রোযা পালন করে তাওবা এস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের পাপের বোঝা লাঘব করে নিতে পারলে শেষ দশদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দান করেন। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে স্বীয় রহমতের কোলে তুলে নেন।

রোজার মূল্য ও প্রতিদান

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে

বর্ণিত যে, রাসূল (সঃ) বলেন, জান্নাতে বাবুর রাহয়্যান (তৃপ্তদের দ্বার) নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সেই দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণই বেহেশতে প্রবেশ করবেন অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। সেদিন উচ্চ স্বরে ঘোষণা করা হবে যে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রমযান মাসে রোযা রেখে ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছে তারা আজ কোথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে দাঁড়িয়ে উল্লেখিত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, রমযান মাসে রোযার ব্যাপারে যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয় এবং সর্বাধিক ত্যাগ বলে বিবেচিত, তা হলো পিপাসা। তাই এর বিনিময়ে যে প্রতিদান ও পুরস্কার দেয়া হবে তন্মধ্যে পিপাসা নিবারণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে ইংগিত করেই রোযাদারদের বেহেশতে প্রবেশের দরজাকে 'বাবুররাইয়ান" (তৃপ্তদের দ্বার) নাম করণ করা হয়েছে। জান্নাতের প্রবেশের পর রোযদারকে কি পুরস্কার দেয়া হবে তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ রোযা কেবল আমার জন্য আর আমিই দেব এর পুরস্কার।

রোযা এবং কুরআনের সুফারিশ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম (সঃ) বলেনঃ "রোযা এবং কুরআন (কিয়ামতের দিন) বান্দার জন্য মুফারিশ করবে। রোযা বলবে "হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে পানাহার এবং যাবতীয় মানবিক চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি। অতঃপর আপনি আজ তাঁর জন্য আমার সুফারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তার রাতের আরামের নিদ্রাকে হারাম করেছিলাম। অতঃপর আজ তার জন্য আমার সুফারিশ কবুল করুন। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার জন্য রোযা ও কুরআন উভয়ের সুফারিশই কবুল করে নিবেন এবং জান্নাত ও মাগফেরাতের ফয়সালা করে দিবেন।

রোযার দাবী

হযতর আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও অনর্থক কাজ ত্যাগ করবে না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

অর্থাৎ রোযা রেখে মিথ্যা ধোকাবাজী কুসংস্কার, শিরক, বেদআত ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত না হলে এমন রোযা কোন কাজে আসে না।

এ'তেকাফ

ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাংসারিক কাজ-কর্ম হতে অবসর গ্রহন করে মসজিদে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলা হয়। হানাফী মতে এ'তেকাফ তিন প্রকার (১) ওয়াজিব এ'তেকাফ-নযর ও মান্নতের এ'তেকাফ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যদি মনস্ত করে যে, আমার অমুক কাজ সমাধা হলে বা অমুক আশা পূর্ণ হলে আমি এ'তেকাফ করবো অথবা এমনিতেই যদি কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এ'তেকাফ করার নিয়ত করে, তবে তার উপর এ এ'তেকাফ ওয়াজিব হয়ে যায় এবং নিয়তকৃত মেয়াদ পূর্ণ করা তার জন্য কর্তব্য হয়।

(২) সুন্নত এ'তেকাফঃ রমযান শরীফের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দিনসমূহে এ'তেকাফ করেছেন। রমযানের বিশ তারিখ সন্ধ্যা অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় থেকে তা শুরু করতে হয় এবং ঈদের দিনের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এর মেয়াদ। এই এ'তেকাফ সুন্নাতে মোয়াক্কাদা-এ কেফায়া।

(৩) মোস্তাহাব বা নফল এ'তেকাফঃ ওয়াজিব এবং সুন্নত এ'তেকাফ ছাড়া সব এ'তেকাফই মোস্তাহাব। বছরের সকল দিনেই এ এ'তেকাফ পালন করা যায়। ফযীলতের কারণে স্বল্প মেয়াদের জন্যে হলেও সকলের এ'তেকাফে যাবার চেষ্টা করা উচিত।

রমযানের বিশ তারিখ বহু রোযাদার মসজিদে এ'তেকাফে বসেন। দুনিয়াবী সকল চিন্তাভাবনা ও কায়কারবার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে রমযানের শেষদশ দিন কোনো মসজিদের এক কোণে অবস্থান নেন। এ'তেকাফের অনেক সওয়াব রয়েছে। খোদ আল্লাহ্‌র রসুল এ'তেকাফের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। এ'তেকাফের দ্বারা নির্ঝঞ্জাটের মধ্য থেকে একনিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায়। এ সময়টির মধ্যে কায়মনোবাক্যে কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায, যিকির-ফিকির, তসবীহ-খানী, মুনাজাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একজন লোক আত্মশুদ্ধির এক মহত্তর স্তরে নিজেকে পৌঁছাতে পারে। মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাআলার নিকট তার কোন ভক্তের সম্পূর্ণ একাকিত্বে অখণ্ড মনে দোয়া মোনাজাত করা এবং তাঁর স্মরণে নিয়োজিত থাকা এমনিতেও অতি প্রিয় কাজ। উপরন্তু এ'তেকাফে মাহে রমযানের পুণ্যময় দিবস-রজনী একই অবস্থায় থাকাটা যে আত্মশুদ্ধির জন্যে কত বেশী সহায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

রমযানে তারাবীহ, নফল নামায, কুরআন অধ্যয়ন, যিকির-ফিরিক তাসবীহখানী ইত্যাদি কাজগুলো হুকুমের দিক থেকে অপরিহার্যতার পর্যায়ভুক্ত না হলেও আরও নানান দিকের বিচারে এগুলোর সওয়াবের পরিমাণ রমযান মাসে অধিক হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "তারা আপন প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাযে দণ্ডায়মান এবং সিজদার মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করে। আর (এ বলে আমার নিকট প্রার্থনা জানায় যে,)—হে প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের সাস্তিকে দূর করে সরিয়ে রাখো।" কুরআন

মজীদের অন্যত্র মহানবীর প্রতি ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রাতে ঘুম থেকে জাগা কু-প্রবৃত্তির দমনের একটি কঠোর পন্থা এবং বক্তব্য হিসেবে সুদৃঢ়। দিনের বেলা তোমার অনেক ব্যস্ততা থাকে। সুতরাং রাতের বেলা তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং সকল কিছুর সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র তাঁর দিকেই রুজু হয়ে যাও। উল্লেখ্য যে, মহানবীর দিনের বেলায় কর্মত ৎপরতা নবুয়তী কাজের বাইরে ছিলো না, তার পরও রাতের গভীরে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ রুজু হবার নির্দেশ থেকে একান্ত আল্লাহ্‌র ধ্যানের গুরুত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলার অপেক্ষ রাখে না যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের এ মহৎ কাজগুলো মাহে রমযানের মধ্যে বিশেষ করে রাতের অংশে এবং এ'তেকাফের ও মহিমান্বিত শবে কদরে অধিক কল্যাণবাহী হয়ে থাকে। আর এমনি করে এগুলো রোযার অপরিসীম সওয়াব প্রাপ্তিতে ও রোযার মূল লক্ষ্য অর্জনে সোনায় সোহাগার কাজ করে। এভাবে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত-নফল ইত্যাদি আমলের সওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কেই হাদীসে সে শুভ সংবাদ প্রয়োজ্য হয়, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যথারীতি রমযানের রোযা পালন করে সে যেন সদ্য জন্ম-নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় মাসুম বেগুনাহ বান্দায় পরিণত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেন, এ'তেকাফের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে নিজেকে একাকার করে নেয়া। এ'তেকাফকারী দুনিয়ার সব ভুলে গিয়ে প্রভুপ্রেমে এতই বিভোর হয়ে পড়ে যে, তার সকল ধ্যানধারণা, চিন্তা-ভাবনা একমাত্র তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা। এ সম্পর্ক ও ভালোবাসা তার করবের সঙ্গী-সাথীহীন অবস্থায় সহায়ক হবে।

মারাকিউল ফালাহ কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে, এ'তেকাফ আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে পালিত হলে তা বান্দার আমলসমূহকে উত্তমতার চূড়ান্ত মনযিলে পৌছায়। কারণ, এতে বান্দা দুনিয়ার সকল কিছুর মায়া ভুলে একমাত্র আল্লাহ্‌রই পানে মুখ ফিরায়। সর্বতোভাবে প্রভুর সমীপে আত্মনিবেদন করে এবং তাঁরই করুণার দুয়ারে মাতা ঠোকে। তদুপরি এ'তেকাফের প্রতিটি মুহূর্ত এবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, কেননা এ'তেকাফকারীর শয়ন-স্বপন সব কিছুই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য হন। হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিগত অগ্রসর হয় আমি তার পানে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

মাসআলা

পুরুষের জন্যে এ'তেকাফের সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদুল হারাম, অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ, তারপর ঐ মসজিদ যেখানে জুমার জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মতে, যে মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায জামায়াতে আদায় করা হয , সে মসজিদে এ'তেকাফ করা চলে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে 'মসজিদ' বলে স্বীকৃত, তাতে পাঞ্জেগানা জামাত রীতিমতো না হলেও এ'তেকাফ করা দুরস্ত আছে।

মহিলাদের এ'তেকাফ

মহিলারা পারিবারিক পরিমণ্ডলে নির্দিষ্ট মসজিদে বা নামাজের কামরায় এ'তেকাফ করবেন। কোনো নির্দিষ্ট স্থান না থাকলে ঘরের কোনো একটি নির্জন কোণ এ'তেকাফের জন্য বেছে নেয়া উচিত। পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের এ'তেকাফ সহজসাধ্য। তারা ঘরের অন্যের দ্বারা গৃহকর্ম করিয়ে সাংসারিক কাজ চালিয়ে যেতে পারেন অথচ এ'তেকাফের সওয়াবেরও অধিকারী হতে পারেন। আমাদের মহিলা সামাজের জন্যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে শিশুদের হৈচৈ কিংবা অন্যান্যদের কথা বার্তার আওয়াজ থেকে দূরে থেকে একনিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ পালন খুব কমই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটির প্রতি যাদের সামর্থ্য আছে তারাও গুরুত্ব দেন না। অথচ নির্জন পরিবেশ ছাড়া ঘরের লোকদের কথাবার্তা ও ছেলেমেয়েদের আনাগোনার মধ্যে নামায, ইবাদত কিছুই ঠিকমত মন দিয়ে করা যায় না।

এ'তেকাফে যেসব কাজ জায়েয

(১) পেশাব পায়খানার প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া, (২) গোসল ফরয হলে গোসলের জন্যে বের হওয়া, (৩) জুমার নামাযের জন্য (বেলা ঢলে যাবার পর কিংবা এতটুকু আগে বের হওয়া যে জামে মসজিদে গিয়ে খুৎবার আগে চার রাকাত সুন্নত পড়া যায়), (৪) পেশাব-পায়খানার জন্যে জায়গা যতদূরেই হোক যেতে পারবে, (৫) মসজিদে খানা-পিনা, শোয়া, দরকারী কিছু কিনে নেয়া যা মসজিদে নেই, জায়েজ রয়েছে।

যেসব কারণে এ'তেকাফ নষ্ট হয়

(১) এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীর শর্যাসঙ্গী হওয়া, যদিও সেটা ভুলেই হয়ে যাক না কেন।

(২) বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে যাওয়া।

(৩) কোন ওজরে মসজিদ থেকে বাইরে যাবার পর প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় সেখানে অবস্থান করা।

(৪) রোগ কিংবা ভয়জনিত কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া। এ সকল অবস্থায় এতেকাফ বিনষ্ট হয়।

যে সকল কারণে এ'তেকাফ মাকরূহ হয়

(১) সম্পূর্ণ নীরব থাকা এবং কারুর সাথে আদৌ কথা না বলা, (২) মসজিদে পণ্য সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়, (৩) কলহদ্বন্দ্ব ও বাজে কথা চর্চা করা।

এ'তেকাফে মোস্তাহাব কাজ

(১) কথা বলার সময় নেকীর কথা বলা।

(২) কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা।

(৩) দরুদ শরীফ পড়া।

(৪) নফল নামায পড়া।

(৫) দ্বীনী ইলম হাসিল করা কিংবা অপরকে শিক্ষাদান করা।

(৬) ওয়াজ-নসীহত করা

(৭) মসজিদে এ'তেকাফ করা।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদা রমযান মাসে রসূলুল্লাহ প্রথম দশক এ'তেকাফ করলেন। তারপর মধ্যবর্তী দশকেও। অতঃপর তিনি যে তাঁবু খাটিয়ে এ'তেকাফ করছিলেন, সেই তুর্কী তাঁবুর মধ্য হতে মাথা বের করে আমাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি শবে কদরের প্রথম দশকে এতেকাফে কাটালাম। অতঃপর মধ্যবর্তী দশকও কাটালাম। তারপর এক আগন্তুক (ফিরিশতা)-এর মাধ্যমে আমাকে জানানো হলো যে, এটা শবে কদর মাসের শেষ দশক। সুতরাং যারা আমার সাথে এ'তেকাফে আছো, তাদের শেষ দশকও এ'তেকাফে কাটানো উচিত। আমাকে এ রাতটি দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি সে রাতের প্রত্যুষে কাঁদা মাটিতে সেজদা করেছি। সুতরাং তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে শবেকদরের অনুসন্ধান করো। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, সেরাতটিতে বৃষ্টি হয়েছিল। মসজিদ ছিল ছাপড়ার। বৃষ্টির ফলে ছাদ দিয়ে পনি ঝরছিল। আমি স্বচক্ষে সেই ভোরে রসূল করীম (সাঃ)-এর ললাটে কাঁদা মাটির চিহ্ন দেখেছি, এটা ছিল ২১ রমযানের ভোর বেলা।

শবেকদর-মহিমান্বি রাত

আল্লাহ্ তায়ালা গোটা বছরের সকল রাতের মধ্যে যে একটি রাতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেটি হলো 'লাইলাতুল কদর'-মর্যাদার রাত। তাঁর ভাষায়ঃ

"আমি এক মর্যাদার রাত লাইলাতুল কদরে (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। কদর রজনীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি?-কদর রজনী হচ্ছে হাজার মাসের চাইতে শ্রেয়। অসংখ্য ফিরিশতা ও জিবরাঈল ঐ রাতে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতিটি কল্যাণের বস্তু নিয়ে যমীনে অবতীর্ণ হন। এ রাতটি আগাগোড়াই শান্তিময়-সালাম। এমন কি ফজর তথা সোবহে সাদেক প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে।"

এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে দু' একটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করছিঃ (১) হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) বর্ননা মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কদরের রাতে সওয়াব হাসিলের আশায় (ইবাদের জন্যে) দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। -(তারগীর বৃঃ মঃ উদ্ধৃতিসহ)। হযরত ওমর (রাঃ) এশার নামায পড়ে ঘরে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং ফজর পর্যন্ত নফল নামায পড়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।

শবেকদর রহস্যাবৃত থাকা সম্পর্কে ওলামা-এ-মুহাদ্দেসীনের মত হলো এই যে, (১) নির্দিষ্ট করা হলে অনেক গাফেল লোক অন্যান্য রাতে ইবাদত করাই ছেড়ে দেবে। (২) অনেক লোক রয়েছে যারা পাপকর্মে লিপ্ত হত, তবে তা তার জন্যে অধিক বিপজ্জনক হতো। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। একবার নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, এক সাহাবী মসজিদে ঘুমাচ্ছেন। তিনি হযরত আলীকে বললেন, আলী যেন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে ওযু করতে বলেন। হযরত আলী এ নির্দেশ পালন করার পর হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো সকল পুণ্যকাজেই অগ্রগামী, এ ব্যাপারে আপনি নিজে তাকে না বলে আমাকে দিয়ে জাগানোর ও বলানোর তাৎপর্য আছে কি?' হুযুর (সাঃ) বললেন, আমার ভয় হয়, ঘুমের ঘোরে পাছে সে ব্যক্তি গাত্রোত্থান করতে অসম্মত হয় আর নবীর কথা অমান্য করায় কুফরীতে নিপতিত হয়ে পড়ে। তোমার কথায় অস্বীকৃতি জানালে কুফরী হতো না। (৩) শবেকদর নির্দিষ্ট থকলে এবং ঘটনা চক্রে কোনো ব্যক্তি উক্ত রাতে এবাদত হতে বঞ্চিত হলে, এ শোকে সে পরবর্তী রাতগুলোতে আর ইবাদতের জন্যে জাগতে পারতো না। (৪) শবেকদরের ইবাদত করার উদ্দেশ্যে যে সব রাতে জাগরণ করা হয়, সে সব রাতের স্বতন্ত্র নেকী পাওয়া যায়। সাহাবা-ই-কেরাম (রাঃ) রাতেরনফল নামাযে একএকরাকাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করে দিতেন।

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন শবেকদর উপস্থিত হয়, তখন জিব্রাঈল (আঃ) একদল ফিরিশতা সহ পৃথিবীতে অতবরণ করেন এবং দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণে রত বান্দাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তারপর ইদের দিন যখন রোযা ভাঙ্গার সময় আসে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা ফিরিশতাদের কাছে তাঁর বান্দাদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, ফিরিশতাগণ! মজুর তার কার্য সম্পাদন করলে তার প্রতিদান কি? জবাবে ফিরিশতাগণ আরয করলেন, প্রভু! পূর্ণ পারিশ্রমিক দান করাই তার প্রতিদান।— অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দারা! যাও, আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম এবং তোমাদের পাপরাশিকে নেকীতে পরিবর্তিত করে দিলাম।

শবেকদর রহস্যাবৃত থাকার তাৎপর্য

রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর কোনো একটিতে শবেকদর হয়ে থাকে। এর প্রত্যেকটিতে এ মহিমান্বিত রজনীটি অনুসন্ধান করার জন্য রসুল (সাঃ) হুকুম করেছেন। বলা বাহুল্য, এদিক থেকে এ'তেকাফে উপবিষ্ট ব্যক্তিরাই অতি ভাগ্যবান। কেননা তারা রমযানের শেষ দশদিনের প্রত্যেকটি দিনেই সওয়াব লাভের সে সুযোগ নিতে পারেন।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সিয়াম, ই'তেকাফ ও শবেকদরের নেকী লাভের পুর্ণ তওফীক দান করুন।

হিন্দু ধর্মের স্বরূপ সন্ধানে

শামস নবীদ ওসমানী

অনেক হিন্দু -সুধী ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যারা আগ্রহ রাখে, যারা ইসলামের প্রতি সামান্য অনুরক্ত তাদেরকে কখনও অভিযোগের সুরে বলতে শুনা যায়, কুরআনের মধ্যে বহু জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুপ্রাচীন হিন্দু জাতি সম্বন্ধে একটি কথাও সমগ্র কুরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সকল সুধীদের অভিযোগের জবাব দিতে আমরা যখন গলদঘর্ম হই তখন এক বারও আমাদের খেয়ালে এ কথা আসে না যে, আমার মনের কোণে পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের মত এমন কোন অভিযোগ উকিঝুকি মারছে না তো!

শ্রী গংগা প্রসাদ উপধ্যায় নিজ বিদ্যার জোরে মূল আরবীতে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তা থেকে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে উর্দু ভাষায় 'মাসাবীহুল ইসলাম' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

"পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, খোদা তাআলা যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন নবী প্রেরণ করেছেন। বহু জাতি ও গোষ্ঠীর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হলেও দু'একটি বাদে কারও সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হলো, পৃথিবীর যে সকল জাতির ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, যেমন হিন্দুস্তানী ও চীনা প্রভৃতি এদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয়নি—কোথাও কোন ইংগিতও এদের প্রতি করা হয়নি। তাই এই গায়েবী গ্রন্থখানা যাকে কালামে মাজীদ নামে অবিহিত করা হয় এর সাথে মানুষ ও তার ইতিহাস-ঐতিহ্যের কি সম্পর্ক আছে?"

উপরোক্ত অভিযোগের প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, এই কুরআন বা কালামে এলাহীর প্রথম শ্রোতা ছিলেন আরবগণ। এ কথাও পরীক্ষিত ও স্বীকৃত যে, এই পবিত্র গ্রন্থখানা কেবল চৌদ্দশত বছরের পুরাতন কোন গ্রন্থ নয় এবং শুধু তৎকালীন পরিস্থিতি ও সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেনি বরং বর্তমান বিশ্ব ও এই সময়ের সমাধানও এতে বিধৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত অভিযোগ কি করে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম যে সব জাতি তাদের সম্বন্ধে কুরআনের কোথাও কোনভাবে আলোচনা করা হয়নি? আমি মনে করি, মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কুরআনের প্রতি এমন অভিযোগ করা শুধু অন্যায়ই নয় বরং বালখেল্যও বটে। আমরা কি কখনও হিন্দু জাতির নাম ও পরিচয় কুরআনে সন্ধান করেছি? আমলে আমরা কখনও কুরআনের পাতায় সন্ধানী দৃষ্টিতে হিন্দুদেরকে সন্ধান করিনি। শুধু আমরা কেন কখনও কেউ করেনি। যা দুঃখ জনক বই কি।

এবার লক্ষ্য করুন, কুরআনের মধ্যে খাসা হিন্দু শব্দটি পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু ঈসায়ী বা খৃষ্টান নামটি পাওয়া যায় কি? ঈসায়ী নামটিও কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে কুরআনে ঈসায়ীদের বেলায় নাসারা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পৃথিবীর কোন খৃষ্টান বা ঈসায়ী এখন নিজেদেরকে নাসারা বলে পরিচয় দেয়না। অথচ সকলের জানা আছে যে, কুরআনের ওই সকল লোকদেরকেই নাসারা বলা হয়েছে যাদেরকে আমরা খৃষ্টান বা ঈসায়ী বলি। তাই বিচিত্র কি যে, যে জাতিটি আজ নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় কুরআনে তাদেরকে অন্য কোন নামে সম্বোধন করা হয়েছে?

কুরআনের মধ্যে এমন বহু জাতির নাম এসেছে যাদের সঠিক পরিচয় আজও নির্দ্ধারিত করা যায় নি। যেমন 'আস্‌হাবুররুস' ও 'কওমুত্তুবাআ'। তবে কুরআনের বহু স্থানে মুমিন, ইয়াহুদী, নাসারাদের পাশাপাশি সাবিঈনদেরকে এমন ঘনিষ্ঠ সংযুক্তির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মনে হয়, এরা তৎকালীন বিশ্বের সেরা জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে কোন একটি হবে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ইয়াহুদী খৃষ্টান ও সাবিঈনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ওপর ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" -বাকারাঃ ৬২তম আয়াত।

উপরোল্লিখিত আয়াতে সাবিঈনদেরকে মুমিন, ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে স্থান দেয়া হয়েছে। কেবল এই একটি আয়াতেই নয় বরং কুরআনের যে যে স্থানে সাবিঈনদের নাম উল্লেখিত হয়েছে সেখানে তৎকালীন বিশ্বের বড় বড় জাতির কথা আবশ্যকীয়রূপে দেখা যাচ্ছে। অথচ এই বৃহৎ ও কুরআনের মধ্যে গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত জাতিটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এ পর্যন্ত আমরা সফল হতে পারিনি। এদের অস্তিত্বও আমরা অস্বীকার করতে পারিনি? তবে একটু আন্তরিকতার

সাথে গভীর ভাবে ভাবলে অতি সহজেই যে এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সূত্র পেয়ে যাব তা হলফ করে বলতে পারি। এবার আমরা সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

অতএব দেখা যাক বর্তমান বিশ্বের মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীর মত সমপর্যায়ের বৃহৎ কোন জাতি আছে কি নেই। যদি থাকে তবে সাবিঈনরা যে আজও একটি সুবৃহৎ জাতি তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। এ কথার ব্যাখ্যায় পরে আসছি। এ ছাড়াও অন্য একটি সূত্র ধরে আমরা এদের সন্ধানে পা বাড়াব।

শরীয়াত ওয়ালা যত নবীর আলোচনা পবিত্র কুরআনে এসেছে বিশেষভাবে একাধিকবার যাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে তারা হলেনঃ হযরত নূহ আঃ, হযরত ইব্রাহীম আঃ, হযরত মূসা আঃ, হযরত ঈসা আঃ এবং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাঃ।

যথা পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আমি নবীদের নিকট থেকে, তোমার নিকট থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও মরিয়াম তনয় ঈসার নিটক থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম—গ্রহণ করেছিলমা বড় অঙ্গীকার।" –আহ্‌যাবঃ ৭ম আয়াত।

"আমি তোমাদের জন্য দ্বীন নির্ধারিত করেছি যার নির্দেশ নূহকে দিয়েছিলাম–যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম মূসা ও ঈমাকে এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মদভেদ কর না।" –শুরাঃ ১৩তম আয়াত।

আমরা লক্ষ্য করেছি, কুরআনের মধ্যে যত বড় বড় জাতির নাম পাশাপাশি একসঙ্গে এসেছে তারা হলো মুসলমান, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও সাবিঈন। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সমমর্যাদার সাথে পাশাপাশি যে সকল নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে তারা হলেন, মুহাম্মাদ সাঃ, ঈসা আঃ, মূসা আঃ ও নূহ আঃ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মুসলমানরা হলো মুহাম্মদ আঃ–এর উম্মত। খৃষ্টানরা (এখনও) ঈসা (আঃ)কে তাদের নবী হিসেবে মনে করে, ইয়াহুদীরা অনুসরণ করে মূসা (আঃ)–কে। বাকি থাকে সাবেঈন সম্প্রদায়। যাদের বিস্তারিত ও সঠিক পরিচয় দানে ইতিহাস নিরব। তাই বলে কি আমরাও নিরব থাকব। কোনদিন কি উদ্ধার করা হবে না এদের পরিচয়? তাই এদের সঠিক পরিচয় আবিষ্কার করার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সুপ্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, পরিভাষাগতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর উম্মাতকে মু'মিন বলা হয়, হযরত ঈসা (আঃ)–এর অনুসারীদেরকে খৃষ্টান বলা হয় এবং হযরত মূসা (আঃ)–এর কথিত অনুসারীদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়। এবার আপনারাই বলুন, যে নূহ (আঃ)–কে কুরআনের প্রায় সব জায়গায় এই সকল নবীর পাশাপাশি সমমর্যাদার সাতে উল্লেখ করা হয়েছে তার উম্মতকে কি বলা হয়? কে দিবেন এর উত্তর! তবে কি আমরা বলতে বাধ্য নয় যে, হযতর নূহ (আঃ)–এর অনুসারীদেরকেই সাবিঈন বলা হয়? [চলবে]

অনুবাদঃ মনযূর আহমাদ

লিভার ও কিড্‌নীর রোগীরা লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি লোক লিভার ও কিড্‌নী রোগে ভুগছে, যাদের বার (২) জন্ডিস হয়, মুখে দাগ পড়ে, চক্ষের পার্শ্বে কালো দাগ, অল্প বয়সে চোয়াল ভেঙ্গে যায় ও দিন দিন স্মৃতিশক্তির হ্রাস পাচ্ছে এবং মলের সাথে Mucus যাচ্ছে। তাদের অবশ্যই লিভারের কোন না কোন সমস্যা আছে। এ ছাড়া প্রস্রাবের ধারণ–ক্ষমতা কমে যাওয়া, কোমরে ও নাভীর নিম্নে চিন (২) করে বেদনা করা, যৌন শক্তি দিন দিন কমে যাওয়া, প্রস্রাব পরীক্ষায় Albumin Trace; pus cell ও Epithelial Cells বেড়ে গেলে কিড্‌নীর সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই আপনার লিভারের HBs Ag Test ও Bilirubin পরীক্ষার দ্বারা সময় থাকতে নিম্নের ঠিকানায় সু–চিকিৎসা করুন।

ধন্যবাদান্তে

যোগাযোগ ও সময়ঃ

হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিক

২৫, সামসুজ্জোহা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলা মটর, ঢাকা

সময়ঃ সকাল ৯টা–১টা, বিকালঃ ৪টা–৮টা

প্রফেসর ডাঃ এন, ইউ, আহমাদ

লিভার, কিডনী, চর্ম ও যৌন রোগের বিশেষ অভিজ্ঞ

বিঃদ্রঃ (জহুরা মার্কেটের উত্তর পার্শ্বের বিল্ডিং)

শুক্রবারঃ৪টা–৮টা।

ইসলামে যাকাত বিধান

মাওঃ নূর মুহাম্মাদ আজমী

যাকাত ব্যবস্থা অনুধাবন করা ব্যতীত ইলামের অর্থব্যবস্থা অনুধাবন করাই সম্ভবপর নয়। তাই এখানে যাকাত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

যাকাতের অর্থ

'যাকাত' শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা। যাকাত দানে যাকাত দাতার মাল বাস্তবে কমে না বরং বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষতা থেকে পবিত্রতা লাভ করে। ইসলামে এর অর্থ শরীয়তের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বাধিকার কোনো অভাবী গরীবের প্রতি অর্পণ করা এবং এর লাভালাভ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা।

যাকাত ইসলামের রোকন

যাকাত ইসলামের রোকন (স্তম্ভ)-সমূহের মধ্যে তৃতীয় রোকন। ঈমান ও নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনে পাকের বহু জায়গায় (২৬) নামাযের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। সূরা বাকারার এক স্থানে বলা হয়েছেঃ

'এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যে ভালো কাজ আগে-ভাগে করবে তা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে (যাকাত হলো তার মধ্যে একটি)।' -২ ঃ ১০০

সূরা তাওবায় বলা হয়েছেঃ 'আপনি গ্রহণ করুন তাদের মাল হর্তে যাকাত যা দ্বারা পাক ও পবিত্র করবেন তাদেরকে।' -৯ ঃ ১০৩

অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ

'এবং খরচ কর তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন হতে বের করেছি তার অংশ (অর্থাৎ তার ওশর দাও)।'

অন্যস্থলে আছেঃ 'এবং আদায় কর আল্লাহ্‌র হক (ওশর) শস্য কাটবার সময়।' -৬ ঃ ১৪৪

যাকাত পূর্বেও ফরয ছিল

যাকাত নামাযের ন্যায় পূর্ববর্তী উম্মতগণের প্রতিও ফরয ছিল। কুরআনে রয়েছেঃ

'যখন আমি বনি ইসরাইলের (য়াহুদী ও নাসারাদের) অঙ্গীকার গ্রহণ করলামঃ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করব না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়, য়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি ইহ্‌সান করবে আর আদায় করবে যাকাত।'

এইরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে!

যাকাত না দেয়ার পরিণাম

যাকাত দান না করার পরিণাম সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

'যারা সোনা রূপা জমা করে অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তা খচর করে না (অর্থাৎ তার যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের, যে দিন গরম করা হবে তাদেরকে দোযখের আগুনে, অতঃপর দাগ দেয়া হবে তা দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ কর তার যা তোমরা (দুনিয়াতে) জমা করেছিলে।'

-৯ ঃ ৩৪, ৩৫

অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ

'আল্লাহ্ যাদেরকে আপন ফজল (সম্পদ) হতে কিছু দান করেছেন আর তারা তা নিয়ে কৃপণতা করে যে, তা তাদের পক্ষে মঙ্গল বরং তা তাদের পক্ষে অমঙ্গল। শীঘ্রই কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছে।'

যাকাত কবে ফরয হয়েছে

যাকাত ফরয হয় মক্কাতেই কিন্তু তখনও কি কি মালে যাকাত হবে এবং কি পরিমাণ মালে কত যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়নি। অতএব, সাহাবিগণ নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত যা থাকত প্রায় তা সবই দান করে দিতেন। -তফসিরে মাজহারী

অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় এর বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়। এ কারণে বলা হয় যে, মদীনাতেই যাকাত ফরয হয়েছে।

যাকাতের হার

কুরআনে রয়েছেঃ

'আর যাদের মালে রয়েছে 'নির্ধারিত' হক' যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের।' -৭০ ঃ ২৭

এতে বুঝা গেল যে, যাকাতের হার আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। তবে তিনি তা আমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে না জানিয়ে রাসূলের হাদীসের মাধ্যমেই জানিয়েছেন। হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ মওজুদ রয়েছে।

যাকাত অস্বীকার করা কুফরী

যাকাতের হার 'ওহীয়ে গায়রে মাতলু' হাদীসের মাধ্যমে জানা গেলেও কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার মূল কথাটি কুরআনেই স্পষ্টভাবে রয়েছে। অতএব, যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদ বা কাফির। এ কারণেই প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর

(রা) য়ামামার যাকাত অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য

(ক) যাকাত মুসলমানদের মালের ট্যাক্স নয়। এ একটি অর্থভিত্তিক ইবাদত। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি স্তম্ভ। এ কারণেই তা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের উপর ফরয করা হয়নি। এবং এ কারণেই যাকাতদাতা বিনা তলবে স্বেচ্ছায় আপন মালের গোপন হতে গোপনতর তহবিলের যাকাত আদায় করে থাকে। আর ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে নানারূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে অথচ এতে তার ঈমানের কোনরূপ ক্ষতি হবে বলে সে মনে করে না। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে তার ঈমানের ক্ষতি হবে বলে সে মনে করে।

(খ) করদাতা স্বয়ং করের লাভ ভোগ করে থাকে। কর দ্বারা দেশরক্ষা করা হয় এবং রাস্তাঘাট ও পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। আর করদাতা এর সুবিধা ভোগ করে কিন্তু যাকাতদাতা যাকাতের কোন সুবিধা ভোগ করে না তার সুবিধা ভোগকরে একা যাকাত গ্রহীতাই।

(গ) কর ধার্য করা হয় মালের আয়ের উপর আর যাকাত ধার্য করা হয় মোট মালের উপর। যাকাত আয় ও মূলধনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। ব্যবসায়ের জন্য মওজুদ রাখা মূল মালে এমন কি উৎপাদনশীল মাল ঘরে বসিয়ে রাখলে অথবা তা দ্বারা ব্যবহারের জন্য গহনা তৈয়ার করা হলেও তাতে যাকাত ফরয।

(ঘ) যাকাতের মধ্যে করের সমস্ত উত্তম গুণ বিদ্যমান কিন্তু তার হার পরিবর্তনশীল নয়। তা আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট।

এ কারণেই বিগত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কোন স্বেচ্ছাচারী হতে সেচ্ছাচারী সরকারও যাকাতের হার পরিবর্তন করতে সাহস করেনি। [হযরত ওমর (রাঃ) জিযিয়া করের হার বাড়িয়ে ২৪ দিরহামের স্থলে ২৬ দিরহাম করেছিলেন, যাকাতের হার নয়। আর জিযিয়া যাকাতের অন্তর্গত নয়।

করের হার পরিবর্তনের অধিকার সরকারকে অমিতব্যয়ী করে তোলে এবং জনসাধারণের প্রতি আর্থিক জুলুম করতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যাকাতের হারের নির্দিষ্টতা সরকারকে মিতব্যয়ী হতে এবং জনসাধারণের প্রতি আর্থিক জুলুম হতে বিরত থাকতে বাধ্য করে।

যে যে মালে যাকাত ফরয

যাকাত মুসলমানের প্রায় যাবতীয় মালেই ফরয। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, উৎপন্ন ফসল, সঞ্চিত সোনা, রূপা, পণ্যদ্রব্য, জমিনে প্রাপ্ত গুপ্তধন ও খনিতে প্রাপ্ত দ্রব্য– সকল প্রকার মালেই যাকাত ফরয।

(ক) উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া যদি ঘাস পানি দেয়া ব্যতীত মাঠে চরে প্রতিপালিতহয় এবং গৃহস্থালীর কাজের অতিরিক্ত ও বিক্রির জন্য অথবা দুধ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য হয় তা হলে তাতে যাকাত ফরয। উট পাঁচ, গরু মহিষ ত্রিশ এবং ছাগল–ভেড়া চল্লিশ সংখ্যায় পৌছলে তাতে যাকাত ফরয হয়।

(খ) জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে 'কনিয' বলে। খণিজাত সোনা রূপা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যকে মা'দেন (মা'দানিয়ত) বলে এবং উভয়কে একসাথে 'রিকাজ' বলে। কখনও কখনও কানযকে রিকাজ বলা হয়। 'রিকাজ' কারও মালিকানাধীন জমিনে পাওয়া গেলে তার এক–পঞ্চমাংশ যাকাত রূপে দিতে হয়। তাকে সাধারণত 'খুমুছ' বলে। গণীমতের পঞ্চামাংশকেও খুমুছ বলে।

(গ) ধান, গম, যব, খেজুর ও আঙুর প্রভৃতি শস্য ও ফলমূল বিনা সেচে বৃষ্টির পানিতে জন্মিলে–অল্প হোক বা বিস্তর– সকল ফসলের দশ ভাগের একভাগ যাকাতরূপে দিতে হয়। তাকে সাধারণত 'ওশর' বলে। এই সকল ফসল সেচ দ্বারা জন্মিলে তার বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতরূপে দিতে হয়। অমুসলমান নাগরিকদের নিকট থেকে গৃহীত ভূমি রাজস্বকে খারাজ বলে এবং তাদের নিটক থেকে গৃহীত দেশরক্ষা করকে জিযিয়া বলে। খারাজ ও জিযিয়া যাকাতের অন্তর্গত নয়।

(ঘ) স্বর্ণ বিশ মিসকাল (সাড়ে সাত তোলা) হলে এবং রূপা দুই শত দিরহাম (সাড়ে বায়ান্ন তোলা) হলে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাতরূপে দিতে হয়। এইরূপে পণ্যদ্রব্যেরও চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাতরূপে দিতে হয়।

যাকাত ব্যয়ের খাত

যাকাত অর্থে এখানে মুসলমানদের গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, সোনা–রূপা, কৃষিদ্রব্য (অর্থাৎ ওশর বা ভূমি রাজস্ব) ও পণ্যদ্রব্যের যাকাতকে বুঝান হয়েছে। এর ব্রয়ের খাত আল্লাহ্ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"সাদাকাত (যাকাত) শুধু (১) অভাবীদের জন্য (২) নিঃস্বম্বল ব্যক্তিদের জন্য (৩) উসুলকারী কর্মচারীদের জন্য (৪) মুআল্লাফাতুল কুলুবদের জন্য (৫) দাসদের দাসত্ব মোচনে (৬) দায়গ্রস্তদের দায় পরিশোধে (৭) আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (৮) (সাময়িক অভাবে পতিত) মুসাফিরদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ্ হচ্ছেন জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাবান। –তওবাঃ ৬০

ইসলামের পক্ষে যাদের মন জয় করা আবশ্যক তাদের মুআল্লাফাতুল কুলুব বলে। মুআল্লাফাতুল কুলুবকে যাকাত দেয়ার প্রথা ইসলামের বিজয় ঘোষণার পর অনেকের মতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর কারও মতে আবশ্যকবোধে এখনও দেয়া যেতে পারে। – তফসীরে ইব্নু কাসীর

'আল্লাহ্র রাস্তায়' অর্থে এখানে সামর্থ–হীন গাযীদের যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জাম ও পাথেয় করে দেয়াকে বুঝান হয়েছে। কারও মতে হাজীদের সাহায্যও তার অন্তর্গত। – শাযী ও ইবনু কাসীর

ইমাম আজম আবূ হানীফার মতে উসুলকারী কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর বাকি ব্যয়ক্ষেত্রসমূহের যে কোনটাতেই তা ব্যয় করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর মতে পারিশ্রমিক দানের পর বাকি খাতসমূহের প্রত্যেক খাতে অন্ততঃ তিন ব্যক্তিকে দেয়া আবশ্যক।

ইমাম আজম আবূ হানীফার মতে উসুলকারী কর্মচারীদের খাতে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় মোট উসুলের অর্ধেক পর্যন্ত ব্যয় করা যেতে পারে, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ব্যবস্থাপনায় এক অষ্টমাংশের অধিক ব্যয় করা যাবে না। উসুলকারী কর্মচারীদের যা দেয়া হয় তা হলো তাদের পারিশ্রমিক। অতএব তারা অভাবী না হলেও তা গ্রহণ করতে পারেন।

সরকারের আয়–ব্যয়ের খাত

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের খাত শুধু যাকাতই নয়। তার আয়ের খাত প্রধানত চারটিঃ

১. খুমুছের খাতঃ এই খাতে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালের খুমুছ (অর্থাৎ এক–পঞ্চমাংশ), জমিনে প্রাপ্ত গুপ্তধন ও খনিজ দ্রব্যের খুমুছ এবং শত্রুর ত্যাজ্য সম্পত্তি জমা হবে।

এর ব্যয়ের খাতঃ আল্লাহ্‌র রাসূল, রাসূলের আত্মীয়বর্গ, য়াতীম, নিঃসম্বল ব্যক্তি ও মুসাফির। কিন্তু রাসূলের ওফাতের পর তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়বর্গের খাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল বাকি তিন খাত রয়েছ। খুমুছের খাতের আয় হতে রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিককেও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যাকাতের খাত থেকে নয়।

২. যাকাতের খাতঃ এ হলো সরকারের আয়ের প্রধান খাত। এই খাতে জমা হবে উট, গরু, ছাগল, ভেড়ার যাকাত। মুসলমান নাগরিকদের ফসলের ওশর এবং মুসলমানদের পণ্যদ্রব্যের যাকাত। অ–ইসলামী সরকারের আয়কর, বিক্রিকর ও রপ্তানীকর মুসলিম সরকারের নগদ টাকা ও পণ্যদ্রব্যের যাকাত রূপেই উসুল করা হয়। সুতরাং এই খাতের আয় বিপুল।

এর ব্যয়ের খাত হল দেশের অভাবী, গরীব, মুসাফির ও কর্মচারীবৃন্দ প্রভৃতি আট প্রকারের লোক যাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ দ্বারা সরকার তাদের অভাব মোচন করবে। যা সরকার সরাসরি তাদের হাতে দিবে। রাস্তা–ঘাট বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে দিলে চলবে না, কেননা, এর ফল গরীব ছাড়া অন্যেরাও ভোগ করে। অবশ্য শিল্পকারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কিছু গড়ে বা এর শেয়ার খরিদ করে তাদের এর মালিকানা দান করলে চলবে। দরিদ্রের স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য মোচনের পক্ষে এ যুগে এটাই অধিক উপযোগী। মোটকথা যাকাত দাদ্রের জন্য একটি উত্তম জীবন বীমা।

৩. খারাজের খাতঃ এই খাতে জমা হবে রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের নিকট হতে গৃহীত খারাজ বা ভূমি রাজস্ব। তাদের নিকট হতে গৃহীত জিযিয়া (দেশরক্ষা কর) এবং অমুসলমান বিদেশী বণিকদের নিকট হতে গৃহীত বানিজ্য শুল্ক ইত্যাদি। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, যে মুসলমান দেশরক্ষা কাজে যোগদান করবে তার নিকট হতে জিযিয়া উসুল করা যাবে না। –মবসুত

এর ব্যয়ের খাত হলঃ দেশরক্ষা, শিক্ষা, বিচার ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজ এবং অমুসলমান গরীব দরিদ্র।

৪. লাওয়ারিশ সম্পত্তির খাতঃ এই খাতে জমা হবে সমস্ত লাওয়ারিশ সম্পত্তি। এর ব্যয়ের খাত হলোঃ লাওয়ারিশ সন্তান, পঙ্গু ব্যক্তি ও রাস্তা–ঘাট প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ। –শামীঃ কিতাবুয যাকাত

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খাতের এই বিপুল অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করা হলে মুসলিম রাষ্ট্রে গরীব–দরিদ্রের নাম–নিশানাও থাকতে পারে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে যাকাত গ্রহণ করার মত গরীব খুঁজে পাওয়া যেত না। দুঃখের বিষয়, অতঃপর কোন সরকারই শরীয়তের এই নির্দেশের অনুসরণ করে নি। ফলে পরবর্তী দুনিয়া ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫. অন্যান্য করঃ অপব্যয় পরিহার করা সত্ত্বেও যদি আয়ের এ সকল খাত সরকারের ব্যয় সংকুলানের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তা হলে সরকারের পক্ষে আবশ্যক অনুযায়ী জরুরী কর ধার্য করার বিধান শরীয়তে রয়েছে। –শামীঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২

৬. যাকাত উসূলের অধিকারঃ উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু, কৃষিদ্রব্য ও বিক্রি কেন্দ্রে নীত পণ্যদ্রব্যকে আমওয়ালে–জাহেরা বা প্রকাশ্য মাল বলে। প্রকাশ্য মালের যাকাত উসুলের অধিকার সরকারের। কিন্তু যদি সরকার তা উসূল করে শরীয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে, তা হলে যাকাতদাতার পক্ষে এহতিয়াত বা সতর্কতামূলকভাবে শরীয়ত নির্ধারিত খাতে পুন দেয়ার কথাই কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন। সোনা–রূপা ও বিক্রি কেন্দ্রে আনীত পণ্যদ্রব্যকে আমওয়ালে বাতেনা বা গুপ্ত দ্রব্য বলে। গুপ্ত দ্রব্যের যাকাত যাকাতদাতা নিজে শরীয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করবেন। তবে যদি তা আদায়ে সাধারণের মধ্যে শৈথিল্যের ভাব দেখা দেয় তখন সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

হুযুর ও প্রথম দুই খলিফার আমলে গুপ্ত দ্রব্যের যাকাতও সরকারের মাধ্যমেই উসুল ও ব্যয়করা হত। খলীফা হযরত ওসমানের আমলে খিলাফতের বিস্তৃতি লাভ ঘটলে ব্যবস্থাপনার ঝামেলা এড়াবার উদ্দেশ্যে তিনি তা যাকাতদাতাদেরকেই উপযুক্ত পাত্রে ব্যয় করতে বলেন। এর উপরই সাহাবীদের ইজমা হয়ে যায়। পরবর্তী শাসকদেরকে যাকাত অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে দেখে পরবর্তী আলিমগণও এই মত প্রকাশ করেন। –শামীঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭

৭. যাকাত অযথেষ্ট নয়ঃ যাকাত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি মাত্র অংশ এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি অংশ। অতএব গোটা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে অন্তত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার সাথে সাথে যাকাত ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে তা যথাস্থানে এমনভাবে খাপ খাবে যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনৈসলামী ব্যবস্থা চালু রেখে এবং অপব্যয় ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে তার সাথে যাকাত ব্যবস্থা চালু করতে গেলে নিশ্চয় তা বেখাপ্পা ও অযথেষ্টই বোধ হবে।

আমার দেশের চালচিত্র

ফারুক হোসাইন খান

রামপুরার রামবাবুরা বড্ড বাড় বেড়ে গেছে। ওদের মাতামাতি দাপাদাপি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একটি মুসলিম দেশের মুসলিম সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বিটিভি নামক শয়তানের আড্ডাখানাটি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানা ও ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। সম্প্রতি বিটিভির গুটিকতেক রামভক্তের চূড়ান্ত আস্কারা পেয়ে জনৈক সুবিধাবাদী 'ফ্যাসাদ আলীর' 'উঠোন' নামক ধারাবাহিক নাটক প্রচার শুরু হয়েছিলো। এই ফ্যাসাদ আলী দেশের স্বাধীনতার পর যখন যে পার্টি ক্ষমতায় এসেছে তখন সেই পার্টির নেতার পায়ে তেল মালিস করে সেই পার্টির অকৃত্রিম সেবক হতে পারঙ্গম। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে তিনি শরীর থেকে মুজিব কোটটি খুলে রেখে ময়দানে ধানের শীষ কুড়াতে নামেন। ধানের শীষ কুড়ানো শেষে আবার সুযোগ বুঝে লাঙ্গল ধরে এরশাদ শাহীকে কাগজে কলমে মহাপুরুষ বানিয়ে ছাড়েন। জনগণের ল্যাং খেয়ে এরশাদ বঙ্গভবন থেকে চারদেয়ালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে এই 'ফ্যাসাদ আলী' গোলার ধান শেষ হচ্ছে দেখে পুনঃরায় ধানের শীষ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তোষামোদ আর ঝোপ বুঝে কোপ মারা বিদ্যেতে এই ফ্যাসাদ আলী এত হাত পাকিয়েছে যে, ভবিষ্যতে যদি পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তবে সুযোগ বুঝে পুরোনো মুজিব কোটটি গায়ে চাপিয়ে সুরুৎ করে নৌকার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে তার মোটেও লজ্জা করবে না। কোন ইসলামী দলও যদি ক্ষমতায় আসে তবে ১০ টাকার একটা টুপি কিনে নিয়ে, কোন আত্মীয় স্বজনকে ধরে কোন ইসলামী দলের একখানা সদস্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

এই বহুমুখী চরিত্রের মানুষটি বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে খুশী করতেগিয়ে উঠোন নাটকের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে জঘন্য খেলায় মেতেছে। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ইসলামকে একটি অন্যায় ও বিরক্তিকর ধর্ম হিসেবে দেখানো হয়েছে। নামাজে কাতার বদ্ধ মুসলমানদের কমিউনিস্ট বলে পরিচিত করতে কসরত করেছে। এই নাটকে একজন টুপি পড়া, দাড়িওয়ালা মুসলমানকে অন্যায়ের প্রতীক ও একজন হিন্দুকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। নামাজকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে একে উপহাসের খোরাক বানিয়েছে এই কীর্তিমান (!) নাট্যকার। আর বিটিভির রাম ও বাম মতাদর্শের তকমা আঁটা কর্তা বাবুরা বেআক্কেলের মত এই নাটকটিকে প্রচার করেছিলো। সচেতন আলেম সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে যেদিন টিভি ভবন ঘেরাও করে সেদিনও রাম বাবুরা জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এ নাটকটি প্রচার করেছে। ওদের উদ্ধত্যের এখানেই শেষ নয়। ওরা মুসলমানদের পবিত্র দিন উপলক্ষে প্রচার করে কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, বিশেষ নাটক ও বাঁদরামীতে পরিপুর্ণ অনুষ্ঠান। রমজানের পবিত্রতাকে উপহাস করে 'শো-গার্ল' সদৃশ্য ললনাদের দ্বারা সংবাদ পাঠ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করানো হয়। মুসলমানদের পয়সায় লালিত পালিত হয়ে আবার সেই মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নিয়ে কুকুর শেয়ালের মত টানা হেচড়া করে চলছে ওরা। ওদের সাম্প্রাদায়িকতার সিং বেশ লম্বা হয়েছে বলে মনে হয়। আস্কারা পেয়ে ওদের হিংস্র দাঁতগুলো ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আর কত? কুকুর পাগল হলে এবং তার প্রতিষেধক না দিয়ে তাকে জনসমক্ষে ছেড়ে দিলে সে নীরিহ মানুষকে কামড়াবেই। সুতরাং রামপুরার ওনাদেরও প্রতিষেধক দেয়া দরকার, ওনাদের হিংস্র দাঁত ও সিংগুলোকে আরো অনিষ্ট করার পূর্বে উপড়ে ফেলা দরকার। এক্ষুণি ঘাদানী-চুবানী দিয়ে ভুতের আছড় থেকে ওদের সুস্থ করা দরকার। কোথায়, কোন বলয়ে লুকিয়ে আছে সার্থক মৌলবাদী মুসলমানরা? তোমাদের ধর্মের মূল উৎখাত করার চক্রান্ত চলছে, তোমরা কি এর প্রতিকার করবে না? নিরব থাকবে আর কত কাল?

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে মানুষের মধ্যে শিক্ষার কোন আলো নেই তার আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যুগে যুগে মহা মনীষীরা মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনুরূপ বহু মুল্যবান কথা বলেছেন। তাই আমার মত নাদান বান্দান এ বিষয়ে নতুন কোন আলোচনা করে পণ্ডিতি জাহির করার খায়েস নেই। এতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে বা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ফেলারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ও পথে না গিয়ে আমি শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে একটা ছোট গল্প বলতে চাই। একদা উপমহাদেশের একজন ঝানু রাজনীতিকএকদিন এক কট্টর মৌলবাদী মোল্লার পাল্লায় পড়ে মসজিদে নামায পড়তে যেতে বাধ্য হলেন। ছোট বেলায় মক্তবে নামাজ পড়া কিছুটা শিখলেও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এবং মসজিদে গমন ও ধর্ম পালন থেকে দূরে থাকার ফলে বার বার তার নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটছিল। অবশেষে

ঈমাম সাহেব যখন "আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্" বলে নামাজ শেষ করলেন, উক্ত নেতা তখন বলে উঠলেন, "ওয়ালাইকুমুস্ সালম মৌলভী সাব!" উল্লেখ্য, এই নেতা মুসলমানতো বটে একটি মুসলিম দেশের ৫টি বছর প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন এবং পরিশেষে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে তার মৃত্যু হয়।

অবশ্যই এই নেতা জীবনে অনেক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন, অনেক বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার শিক্ষা জীবনে এমন একটা ফাঁক ছিল যাতে সে ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করার মত যথার্থ বিদ্যেটুকুও অর্জনকরার সুযোগ পাননি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রেও এরূপ ধর্মীয় জ্ঞানহীন নেতা-কর্মী নেহায়েত কম নয়। বলতে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র এই শ্রেণীর মানুষের হাতেই জিম্মি। রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে ধর্মের প্রভাব মুক্ত ধ্যান-ধারণার দ্বারা। পার্লামেন্ট, সংবাদ পত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা সবই এই শ্রেণীর মানুষের কব্জায়। এরা কিন্তু সকলেই অসংখ্য ডিগ্রীধারী শিক্ষিত মানুষ। অথচ মুসলমানের সন্তান হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে কায়েম করার দাযিত্ব থাকলেও এরা তা সযত্নে পরিহার করে চলে। তাদের এই ব্যর্থতার জন্য কিন্তু তাদের দোষারোপ করে সুবিধা নেই। এই দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্তাব্যক্তিদের ঘাড়ে চাপে।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিল ধর্মীয় এবং বৈষয়িক উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত। তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন সেনানায়ক একই সাথে একজন ধার্মীক, নীতিবান ও আলেম হতেন, ফলে সমাজে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসনকে পাকা-পোক্ত করার জন্য সর্ব প্রথম শাসক জাতি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা বিলুপ্ত করার চক্রান্তে ধর্মহীন ইংরেজী স্কুল এবং মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসন থেকে সকল মুসলমানকে বিদায় করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে যে সব মুসলমানের সন্তানেরা ইংরেজী স্কুল ও মিশনারী স্কুলে লেখা পড়া করত তাদেরকে প্রশাসনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করা হত। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকায় মুসলমানদের এক শ্রেণীর মনে ইংরেজী স্কুলে পড়ার আগ্রহ বেড়ে যায়। মূলত এসব স্কুলে শিক্ষিত মুসলমানদের গোলামী মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা হত। তাদেরকে শেখানো হত আধুনিক পৃথিবীতে যত কিছু আবিস্কার, উন্নতি ঘটেছে, যত সভ্যতা নির্মিত হয়েছে তা সবই ইউরোপের অবদানের ফলে হয়েছে। মুসলমানরা একটা দুর্বল জাতি, তারা পৃথিবীর উন্নতির জন্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। কচি বয়স থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের মাথায় এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয়ায় এবং ইসলামী সভ্যতা, ইতিহাস, শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক রাখতে না দেয়া হয় উপরোক্ত ধারণাকেই তারা সত্য বলে গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে তারা স্কুলের ইউরোপিয়ান শিক্ষক ও অফিসার বসদের সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে গোলামের মত স্যার, স্যার করতে করতে পেরেশান হত। এ অবস্থার জের এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে নেতা ও বসের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই কিন্তু নীতি ও মানসিকতার পরিবর্তন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। কেননা সেই শিক্ষানীতি এখনও এদেশে বর্তমান।

মুসলমানরা ফার্সী ও আরবী ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। ইংরেজরা সেখানেও হস্তক্ষেপ করল। আরবী ও ফার্সী ভাষার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং ভাষাকে অপমানকর পর্যায়ে রাখার জন্য তারা একটা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র আটল। প্রথমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন ঘটায়। অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ব্যবহার শুরু হয়। ফলে, প্রশাসন থেকে ফার্সী ভাষা জানা সাধারণ কর্মচারীরা বাদ পড়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষা তথা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়ার গুরুত্ব আরেক দফা বৃদ্ধি যায়।

যে সমস্ত সরকারী বা আধা সরকারী স্কুলে ফার্সী আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষক ছিল তাদের বেতন-ভাতা ইংরেজী জানা শিক্ষকদের অপেক্ষা কয়েক গুণ কমিয়ে দেয়া হল। ফলে এককালে যে ধর্মীয় শিক্ষকেরা সমাজের প্রতিপত্তি ও সম্মানের পাত্র ছিল; তারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। ইংরেজী শিক্ষিতরা আর্থিক দিক দিয়ে সরকারী আনুকুল্য পাওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালিত পালিত হত এবং তারা উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করার সুযোগ পাওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে তারাই সমাজের দণ্ড মুণ্ডের মালিক হয়ে দাড়ায়। আরবী, ফার্সী ও ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে লোকেরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে ধর্মীয় ও আরবী, ফার্সী ভাষায় শিক্ষিতরা সম্পূর্ণ বেকার একটা শ্রেণীতে পরিণত হয়। প্রশাসনের চৌহদ্দিতে তাদের প্রবেশাধীকার অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বেকারত্বের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং উন্নত জীবনের হাতছানিতে লোকেরা তখন দলে দলে ইংরেজী স্কুলে পড়ানোর জন্য সন্তানদের পাঠাতে থাকে। এই ইংরেজী পড়ুয়া ধর্মীয় শিক্ষা বর্জিত মুসলমানরাই এককালে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য হতে লাগল। ইংরেজদের সৃষ্ট গোলামী মানসিকতা-শ্রেণীর দখলে চলে গেল শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির চাবিকাঠি। 'যেমনি নাচও তেমনি নাচি' পুতুলের মত তারা নৃত্য করতে লাগল। এখনও সে নাচ চলছে।

ইংরেজরা বিদায় হয়েছে অনেক পূর্বে, কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনা এখনও বহন করে চলছে সেই পুতুল শ্রেণীর উত্তর সূরীরা। ইংরেজদের কারণে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত

ও পাশ্চাত্য স্টাইলের জড়বাদী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে একটা দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছিল আজও তা অটুট আছে। আজও মুসলমানের সন্তানেরা ইংরেজদের চেতনায় গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় করে। ওদের প্রত্যেকের চোখের সামনে উন্নত ভবিষ্যত—একটা সরকারী চাকুরী, একটা সুন্দর বাড়ী ও প্রগতিশীল (!) একটা পরিবারে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা পাতানোর স্বপ্নের হাতছানি। এদের গাদা গাদা বইয়ের কোথাও লেখা নেই, 'নিজে সৎ হও, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজের নিষেধ কর'। তার পরও ওরা সেসব পড়ে এবং ওরাই প্রশাসনে থেকে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতায় ডুবে থাকে। স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ওরা এই ঘুনে ধরা পদ্ধতির পরিবর্তন হোক তা চায় না। ইংরেজদের চেয়েও হীন স্বার্থে ওরাই প্রশাসন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দূরে রাখছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আবার এই ইসলামই অন্যান্য মতাদর্শের মানুষের সমাজে যা ভালো ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য তা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু ওরা এই দেশ ও জাতির উন্নতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মহীন ও জড়বাদী শিক্ষাব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু আর কতদিন আমরা বেনিয়াদের ছড়িয়ে দেয়া সমাজ বিধ্বংসী ভাইরাসে আক্রান্ত হতে থাকব? কতদিন নিজেরাই নিজেদের একটা উন্নত ভবিষ্যত গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখব? জাতির উন্নতির অন্তরায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেয়ার মত কোন বিপ্লবী শিক্ষাবিদ কি এদেশে নেই? একজন শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র বড়ই প্রয়োজন আজ!

বাঁদরেরও বাদরামীর সীমা আছে, ওদেরও লাজ-লজ্জার একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কৈবর্তন বিবিদের কোন লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওরা যেমন খুশি নাচে, যেমন খুশি ভেল্কী খেলে। এই দেশের জংলী নারীবাদী আন্দোলনের হোতাদের কথাই বলছি, একজন তো বুড়ো বয়সে রাম-কৃষ্ণের অন্ধ প্রেমে হাবুডুব খেতে খেতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো শুরু করেছেন। ঢাক, শংখ ও কাসা বাজিয়ে উৎসব করছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ইন্দিরা পূজোর মধ্যে উনি স্বর্গের সুখ খুজেঁ পেয়েছেন! নারীবাদী আন্দোলনের ঠ্যালায় নাকি উনি বোরকা ছেড়েছেন। ইদানিং উনি রাম-কৃষ্ণের এত গুণগান শুরু করেছেন যে, আশংকা হয় কবে কোন কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা বা দ্রৌপদির ন্যায় তিনি বস্ত্র হারা হয়ে অবশেষে জন্মলগ্নের অবোধ শিশুর বেশ ধারণ করে ব্যাস্ত রাজপথে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেন।

এই 'কৈবর্তন বিবির' ন্যায় ভীমরতিতে আক্রান্ত একপাল বুদ্ধিবাজের ইমাম জনৈকা মহিলা মোল্লা আর মৌলবাদ, মৌলবাদ করে দেশজুড়ে একটা মাতামাতি ও খিস্তি খেউর তুলে জিহবায় ক্যান্সার বাঁধিয়ে ফেলেছেন। অবশেষে তাকে খালুর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছে দাওয়াই আনতে।

এতো গেলো বুড়ো বাঁদরদের কীর্তি। সেদিন ডিম্পল হুইস্কির বোতলের মত চকচকে চেহারার ত্রিশোর্ধ বয়সের উলংগ নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা 'মিসেস বাঁদর সুন্দরী' দেখালেন এক ভেল্কী খেলা। (স্যরি, ইনি আবার বৈবাহিক সম্পর্কে আস্থাশীল নন কিনা তাই 'মিসেস' নয় তিনি 'গণনারী' বিশেষণটাই বেশী পছন্দ করেন।) তিনি দুই নম্বরী পাসপোর্ট নিয়ে যাচ্ছিলেন তার ধমনীতে যাদের রক্ত প্রবাহমান সেই মামাবাবুদের দেশে। কিন্তু বেরসিক ইমিগ্রেশন অফিসাররা তার অদৃশ্য লেজটা টেনে ধরে এ যাত্রা মামা বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একজন সরকারী ডাক্তার হয়ে সাংবাদিকতার নাম ভাঙ্গিয়ে ইনি পূর্বেও বেশ কয়েকবার ইমিগ্রেশনের ফাঁক গলিয়ে মামা বাবুদের দেশে গিয়েছিলেন। যাহোক, এবার কিন্তু তার সাথে তিনজন সঙ্গী ছিল। আগেই বলে রাখা ভালো, উনি এক স্বামীতে তুষ্ট নন, তাই চার চার বার পোষাকের ন্যায় স্বামী বদলিয়েছেন। অবশেষে ছাপার অক্ষরে একত্রে ৪ জন পুরুষ রাখার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। এবার তার যাত্রায় পুরুষ সঙ্গির সংখ্যা চার থেকে এক কম হলেও মামা বাড়ী যাওয়ার সাথীরা জুটেছিল জব্বরই বলতে হবে— রতনে রতন চিনে কথাটির সার্থক রূপায়ন ঘটেছিল সেদিন। তার অন্যতম বুড়ো সাথী শামসুন রহমান (যিনি ওপারে 'স্যামচুর দদা' নামেই পরিচিত) মনে করেন, 'পরকিয়া প্রেমে পাপ নেই, পরনারীর নিতম্বের দিকে তাকিয়ে তিনি নাকি সুখ পান।' অন্যদিকে আলোচ্য মহিলা নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে পর পুরুষকে প্রদর্শন করে নাকি সুখ সুখ ঠেকেন। তাই একই চিন্তা-চেতনার জুটিটি জমেছে ভালই। কিন্তু তারপরও বয়স নিয়ে একটা কৌতুহল থেকে যায়। সাবাস, এই না হলে ইতিহাস হয়, এই না হলে জমে! জয় হোক তব নারীবাদ (!)

দেশ জুড়ে একটা অশ্লিলতার সয়লাব চলছে। নৈতিকতা ও চরিত্র বিধ্বংসী এ সয়লাব প্রচলিত সমাজ ব্যবস্তার ভীতের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। এ সয়লাবের নাম হল 'যাত্রা'। প্রতি বছর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে গ্রামে-গঞ্জে শহরে শীতের মওসুম শুরু হলেই গরুর পালের মত একপাল পুরুষ-মেয়ে মিলে তথাকথিত লোকজ সংস্কৃতির নামে উদ্যোম নৃত্য আর বেহায়াপনা শুরু করে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা একে সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে এর উদ্বোধন করে আর কীর্তিমান সংস্কৃতিবানরা (?) একে যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী সাংস্কৃতির অঙ্গ বলে নিজেদের অপকর্মের সাফাই গায়। কিন্তু ওনারা বলবেন কি, এই লোকজ সংস্কৃতির সাথে বাংলার মানুষের সংস্কৃতির যোগাযোগ কতদিনের, কবে এর প্রচলন শুরু হয়েছিলো? পারবেন

না। কারণ তাতে নিজেদের উত্তরে নিজেরাই অপমানিত হবেন যে! আধুনিক নারী-পুরুষের সম্মিলিত অপেরার মাধ্যমে যে যাত্রা পালা আমাদের দেশে দেখা যায় এর উদ্ভব হয় ইংরেজদের অনুকরণে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে। হিন্দুদের মাধ্যমে বেনিয়ার জাত ইংরেজরা এই উপহাদেশে অপসংস্কৃতির বীজ বপন করার জন্য শুরুতে শহরে শহরে থিয়েটার স্থাপন করে পাশ্চাত্যের নাটক অভিনয় শুরু করে। এসব নাটকে পাশ্চত্যের নারী পুরুষেরা অশং নিত। উল্লেখ্য, ইংরেজ আগমনের পূর্বে মুসলিম শাসনের শেষাংশে গ্রাম অঞ্চলে এক প্রকার নাটক অভিনীত হত। কিন্তু সেসব নাটকে নারী চরিত্রেও পুরুষেরা অভিনয় করত। কিন্তু ইংরেজদের বদৌলতে তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গনে হিন্দুদের এক চেটিয়া পদচারণার কারণে হিন্দুরা পাশ্চাত্যের থিয়েটারের অনুকরণে অপেরার সৃষ্টি করে। একই সাথে তারা এর মধ্যে নৃত্য ও সংগীতের বিশেষ একটা অংশ জুড়ে দেয়, নারী চরিত্রে নারীরা অভিনয় ও নাচ-গানের সুযোগ পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, হিন্দু ধর্মচর্চায় নাচ-গান একটা বিশেষ অংশ। তাদের ধর্মমতে পর্দা প্রথার কোন গুরুত্ব নেই বলেই তারা অপেরায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য-গীতের একটা নব সংস্করণ জুড়ে দেয়। ক্রমশ এই অপেরা সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে রাজ-শক্তি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে। আজও আমাদের দেশে যে সমস্ত অপেরা দেখা যায় তার সিংহভাগ কর্মী-কলাকৃশলী হিন্দু সম্প্রদায়। কালের ধারায় কিছু সংখ্যক কপাল পোড়া মুসলমানের সন্তানেরা এই অপেরার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে এটা বলা যাবেনা যে, এটা এদেশের মুসলমানদের যুগ যুগের সংস্কৃতি। কেননা, কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন না যে, এই গুটিকতে মুসলমানের সন্তানেরা কেউই ধর্মের অনুশাসন ঠিকমত পালন করেন বা তারা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। বরং বলতে হবে যে, ঐ মুসলিম নামধারী লোকগুলি ইংরেজদের প্ররোচনায় হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্ট হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে মুসলিম সমাজে একে মুসলিম সংস্কৃতির অংশ বলে চালিয়ে দিতে চায়, এরা বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করে এর মধ্যে আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায়। আর এর বিষময় ফল ভোগ করতে হয় এদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের। তথাকথিত প্রিন্সেস আর বাঈজীদের নাচ আর গানের মোহে উঠতি বয়সী তরুণেরা পিতার পকেট কাটছে, ধানের গোলা সাবার করে দিচ্ছে, পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটছে। যাত্রা গানের ফলে কত পরিবারে পিতা-সন্তান ,ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। এখানেই শেষ নয়। তরুণ ও যুবক সমাজ এর বদৌলতে চরিত্র হারাচ্ছে, তারা পথে ঘাটে স্কুল ও কলেজগামী মেয়েদের উত্যক্ত করছে, মদ-গাজা সেবন কেন্দ্র রমরমা হচ্ছে, বখাটের সংখ্যা বাড়ছে, জুয়ার আসরে সর্বশ্রান্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু প্রশাসনের কোন কর্তা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবেন যে, এ ক্ষতির তুলনায় 'যাত্রার' মাধ্যমে সমাজের কানাকড়িও উপকার হচ্ছে?

হচ্ছে না। তার পরও এ মরণ যাত্রা—সমাজ বিধ্বংসী এ যাত্রা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তাদের আস্কারায় হরদম চলছে তো চলছেই। কিন্তু আর নয়, একে থামাতে হবে। এ মরণ ব্যাধিকে সমূলে সমাজদেহ থেকে উৎখাত করতেই হবে। মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হলে এসব আধুনিক ফেতনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। কোথায় সেই টগবগে মুজাহিদীন কাফেলা? এখনও ঘুমিয়ে থাকবে তোমরা?

প্যারাডাইস অপটিক্যাল কোং

চশমার জগতে একটি নতুন নাম
প্রত্যহ বিকালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন

২, পাটুয়াটুলি, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ২৮২৪৮৩

মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?

ইবনে বতুতা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জড়ানো একটি ভূ-খণ্ডের নাম সিরিয়া। সিরিয়াকে বাদে যদি কেউ ইসলামের ইতি-হাস রচনা করতে চান তবে তার ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই সিরিয়ায় পত্তন ঘটেছিল বিখ্যাত উমাইয়া বংশের। মুসলমানরা সর্বপ্রথম যে দুটি পরাশক্তির মুখোমুখি হয়েছিল তার প্রথমটি ছিল রোম সম্রাজ্য। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে মহাবীর খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা রোমকদের নাস্তানাবুদ করে এই সিরিয়া দখল করে। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বখ্যাত বিজয়ী বীর সুলতান সালাউদ্দিন এই সিরিয়ার হাত্তিন নামক স্থানে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডার বাহিনীকে বিপর্যস্থ করে প্রথমবারের মত ক্রুসেডার বাহিনীর হাত থেকে পবিত্রভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করেন। এই সিরিয়ার আইনে জালুতের প্রান্তরে ১২৬০ সালে বিশ্বত্রাস ও অপরাজিত মোঙ্গল বাহিনীকে মিশরের মামলুক শাসক কুতুজ ও দুর্ধর্ষ বেবারস আল বন্দুকধারী ধ্বংস করে দিয়ে রুদ্ধ করেন মোঙ্গলদের ধ্বংসের তাণ্ডব, রক্ষা করেন ইসলামের পবিত্র স্থানগুলো ও মুসলমানদের অস্তিত্ব। শুধু পরাজিত করেই বেবারস ক্ষান্ত হননি। বিশ্বের সামরিক ইতি-হাসে নজীরবিহীন ৩০০ মাইল পর্যন্ত মোঙ্গলবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যান তিনি।

সিরিয়া কৃষি, খনিজ ও পশু সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রাক ইসলামী যুগ থেকেই এই দেশটি এশিয়ার একটি সমৃদ্ধ এলাকা শষ্য-ভাণ্ডার বলে পরিগণিত হত। বলতে গেলে এই ভূ-খণ্ডটি যুগ যুগ ধরে মুসলিম সাম্রাজ্যর প্রাণ স্বরূপ ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলিম বিশ্বের এই সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ডটি এখন আর সত্যিকার মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নেই এবং এর দ্বারা মুসলিম বিশ্বের অনিষ্ট বৈ কানাকড়ি উপকার হচ্ছে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সিরিয়া তুর্কী উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসিত হত। এই বিশ্ব যুদ্ধের সময় মিত্র শক্তি সিরিয়াবাসীদের এই বলে প্ররোচিত করে যে, তারা যদি তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধ শেষে তাদের স্বাধীনতা দেয়া হবে। সিরিয়ার ক্ষমতাসীনরা পাশ্চাত্যের এই হীন জাতীয়তাবাদের ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তুরস্কের পরাজয় ঘটলেও ফ্রান্স ও বৃটেনের গোপন চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন ইরাক, জর্ডান ও ফিলিস্তিন এবং ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবানন কুক্ষিগত করে। উল্লেখ্য, ১৯১৮ সালের পূর্ব সময় পর্যন্ত বর্তমান জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে এই বৃহত্তর সিরিয়া অর্থনৈতিক ভূমিকা ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করত। কিন্তু সাম্রজ্যবাদীরা মুসলিম ঐক্যকে ধ্বংস করা ও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে সিরিয়াকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে ফেলে।

১৯১৯ সালে সিরিয়ায় ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে একের পর এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ফরাসীরাও ততোধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে এ আন্দোলন দমন করে। ১৯২৫-২৬ সালে ফরাসীরা বিমান ও গোলান্দাজ আক্রমণ চালিয়ে দামেস্ক শহরকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে। বহু নগরবাসী এ ঘটনায় নিহত হয়। ফরাসীদের এ বর্বরতায় বিশ্ববাসী শিহরিত হয়ে উঠে। মুসলমানরা ব্যাপক দমন, নির্যাতনের মুখেও ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠে। ফরাসীরা তখন অন্য পথ ধরল। তারা বেশী দিন সিরিয়াকে পদানত করে রাখতে পারবে না বুঝতে পেরেই ভবিষ্যতে যাতে সিরিয়া একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে না পারে সেই সেই ষড়যন্ত্র করে। তারা শিয়া, সুন্নী ও খৃষ্টানদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রচারণা চালিয়ে এককে অপরের শত্রুতে পরিণত করে। জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য ধর্মীয় মত পার্থক্যকে বিরোধে পরিণত করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম্প্রীতির বুনিয়াদ রাখে। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৮০% সুন্নী, ৫% নুসাইরী শিয়া, ৮% খৃষ্টান ও বাকীরা দ্রুজ, উলুবী শিয়া। নুসাইরী ও উলূবী শিয়ারা কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী এবং খৃষ্টানদের ধর্ম চর্চার সাথে তাদের ধর্ম চর্চার ব্যাপক মিল ছিল বলে তারা খৃষ্টানদের ভালো বন্ধু ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় এই নুসাইরী, দ্রুজ ও উলুবী সম্প্রদায় খৃষ্টান বাহিনীকে মুসল-মানদের বিপক্ষে ব্যাপক সাহায্য করে। এরাই খৃষ্টান ক্রুসেডারদের সিরিয়ার সমুদ্র উপকূলে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয় এবং পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। মানব জাতির কলংক তাতারী বাহিনীও এদের সহযোগিতায় মুসলিম দেশ সমূহে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। এ সম্প্রদায়গুলি সকল যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের সময় যখন গোলান উপত্যকায় সিরিয়ান বাহিনী ইসরাইলী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম লড়াইয়ে লিপ্ত, ইসরাইলী বাহিনী যখন পরাজয়ের মুখে ঠিক তখনী সীমান্তের দ্রুজ

সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসরাইলের সমর্থন ঘোষণা করে এবং তাদের পদ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। ফলে সিরিয়ান বাহিনী পাশ্চাদপশারণে বাধ্য হয়। ফিলিস্তিনীরা মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়ান সীমান্তে আশ্রয় নিলে এই দ্রুজ ও নুসাইরী সম্প্রদায় তাদের ওপর ইহুদীদের চেয়েও মারাত্মক অত্যাচার চালায়। ইসরাইলের ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের বিরুদ্ধে তারা গেরিলা ও মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে।

সুতরাং ফ্রান্স সিরিয়ান সুন্নি মুসলমানদের ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েমকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য এই কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী শিয়াদের রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে পুর্ণবাসিত করে। সুন্নিদেরকে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। সেনাবাহিনী, কল কারখানা, প্রশাসন, অফিস-আদালতে 'নুশাইরী' শিয়ারা প্রাধান্য লাভ করে। ফ্রান্স এত সর্বনাশ করেও ক্ষান্ত হয়নি। প্রাচ্যের 'শস্যভাণ্ডার' বলে খ্যাত লেবাননকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে— যা ছিল দীর্ঘ ৬০০ বছর যাবৎ সিরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লেবাননে ভবিষ্যতে খৃষ্টানদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করার জন্য সেখানেও প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে খৃষ্টানীকরণ করা হয়। দেশটির ভবিষ্যত স্থিতিশিলীতা নস্যাত করার জন্য এক বিদঘুটে সংবিধানের আওতায় ম্যারেনাইট খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট, সুন্নি মুসলমান প্রধান মন্ত্রী, স্পিকার শিয়া, পতিরক্ষা মন্ত্রী-দ্রুজ, সেনাপতি খৃষ্টান এরূপ খিচুরী ব্যবস্থা কায়েম করে। সেনাবাহিনীও বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুযায় পৃথক পৃথক গঠিত হয়। ফলে, দেশটিতে পঞ্চাশের দশক থেকে ৪০ বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলে এবং কমপক্ষে ১০টি সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যায়।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাবে ধোকা দেয়ার জন্য ফ্রান্স সিরিয়ার 'মাইকেল আফলাক" নামক জনৈক প্রফেসরের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ বিরোধী 'বাথ পার্টি' নামক একটি রাজনৈতিক দলের পত্তন ঘটায়। এই লোক ফ্রান্সে লেখা-পড়া করে। সে সিরিয়ার বিখ্যাত মাদ্রাসায় প্রথমে ইতিহাসের ওপরে ফ্রান্সী ভাষা শিক্ষার শিক্ষক থাকাকালে মাদ্রাসার মেধাবী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাত উচ্চ শিক্ষার লোভ দেখিয়ে। এভাবে এই চতুর লোকটি সিরিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধর্মহীন করার প্রচেষ্টা চালায়। উল্লেখ্য, উক্ত মাদ্রাসায় তখন সিরিয়ার উচ্চ পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করত। মাইকেল অফলাক যাদের ফ্রান্সে পাঠাতেন তাদের মাথায় ইসলাম বিদ্বেষী চেতনা ঢুকিয়ে দেয়া হত। ১৯৪৯ সালে হুসনে জয়ীম নামক একজন শিয়া জেনারেল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে মাইকেল আফলাক শিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাথ পার্টির আদর্শ প্রচার করার ব্যবস্তা করে ধর্মীয় শিক্ষাকে ধীরে ধীরে তুলে দিতে সামর্থ হয়। সিরিয়ার কলেজ অপ এডুকেশন এবং টিচার ট্রেনিং সেন্টার তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী সকল ছাত্রের জন্য এ প্রতিষ্ঠান দুটির পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। নুসাইরী ও দ্রুজ শিয়ারা বাথ পার্টির মূল চালিকা শক্তি হওয়ায় এই দুই সম্প্রদায়ের সন্তানেরাই মূলত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ পায় এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বাথ পার্টির ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এসমস্ত ছাত্ররা বাথ পার্টির বিষ ক্রিয়ায় এত অধিক পরিমাণ আক্রান্ত হয় যে, এক সময় তারা আল্লাহ্‌র জানাজা পরে তাঁকে বিদায় করে দিয়ে আবু লাহাব ও আবু জাহেলের নামে দুটি প্রমোদ ক্লাব খুলে বসে। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে শিয়াদের প্রাধান্য থাকায় সেখানেও বার্থ পার্টির সমর্থক গড়ে উঠে। ফ্রান্সের এই ত্রি-মুখী ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৬৩ সালে সিরিয়ায় এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বার্থ পার্টি ক্ষমতায় আসে। লেঃ জেনারেল আমিন আল হাফিজ নামক একজন নুসাইরী শিয়া ক্ষমতালাভ করে। ১৯৭০ সালে আরেক অভ্যুত্থানে বর্তমান নুশাইরী শিয়া শাসক হাফিজ আল-আসাদ ক্ষমতা দখল করে। তার আমলেই বার্থ পার্টির অনুসারী শিয়ারা সিরিয়ার ওপর পূর্ণ কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অথচ এরা দেশের লোক সংখ্যার মাত্র ৫%।

১৯৪৪ সালে ইসলাম পন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের প্রচণ্ড চাপের মুখে ফ্রান্স সিরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়। মুলত ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী ফ্রান্সের সৈন্য অপসারণের পরই সিরিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ সালে দেশের প্রধান কয়েকটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন' নাম ধারণ করে একটি সংগঠন কায়েম করে। ইখওয়ান কর্মীরা ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং ১৯৪৫ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে হুসনে জায়ীমের ক্ষমতা দখলের পর ইখওয়ানের ওপর দমন নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করা হয়। একনায়ক হাফেজ আল আসাদের সময় ইখওয়ানের ওপর দমন নির্যাতন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আসাদের বাহিনী সুন্নী মুসলমান ও ইখওয়ানের শক্ত ঘাঁটি 'হামা' অবরোধ করে। গোলান্দাজ বাহিনীর কামানের গোলা ও আকাশ থেকে বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করে শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এই আক্রমণে শহরের ৫ লক্ষ লোকের ৩০ হাজার লোক তাৎক্ষণিক নিহত হয়, ৩৮ টি মসজিদ সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ইসলাম পন্থী রাজনৈতিক দল ও সুন্নী আলেম ও সাধারণ মুসলমানদের ওপর আসাদ সরকারের দমন অভিযান এখনও অব্যাহত আছে।

সিরিয়ার ক্ষমতাসীন বার্থ পার্টির

অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে মার্ক্সবাদ, লেনিন বাদের সমাজতন্ত্রের সাথে অধিকাংশ স্থলে মিল রয়েছে। সিরিয়ার বৈদেশিক নীতিও প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ঘেষা। ১৯৮০ সালে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সিরিয়া ২০ বছর মেয়াদী এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে সোভিয়েত বলয়ে নিজের নাম লেখায়। আসাদ সরকার ফিলিস্তিনীদের অধিকার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে মোটেও আন্তরিক নয় বরং আসাদ সরকার শুরু থেকেই গ্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করে আসছে। ১৯৬৮ সালে সিরিয়া পি, এল,ওর গেরিলাদের ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়। ১৯৭১ সালে সিরিয়া থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সব ধরণের গেরিলা আক্রমণ চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯৭৩ সালে সিরিয়া-ইসরাইল যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রম করা পি, এল, ওর জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৪ সালে পি, এল, ওর যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৮২ সালে ইসরাইলীরা লেবাননে বর্বরোচিত হামলা চালানোর সময় ফিলিস্তিনীদের জন্য আসা রসদ-পত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম সিরীয় বাহিনী কেড়ে নেয়। ১৯৮৩ সালে ১৫ই নভেম্বর সিরীয় গোলান্দাজ বাহিনী পি, এল, ওর বাদাভী ঘাটিতে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে তা' ধ্বংস করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে লেবানন থেকে পি, এল,ওর উচ্ছেদে সিরিয়া সকরারের হাত রয়েছে। বাথ পার্টির অনুসারী নুসাইরী শিয়ারা দেশের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর অর্থনীতির চরম দেউলিয়াপনা দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের বদৌলতে দেশে ৫ হাজার কোটিপতি পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই শিয়া এবং দেশের শোষক গোষ্ঠী। কালো বাজারী, পতিতা বৃত্তি, আধুনিকতার নামে অশ্লীলতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। দেশের সর্বত্র অসংখ্য মদ্যশালা ও বেশ্যালয় গড়ে উঠেছে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন চালু করা হয়েছে। এমনকি মুসলিম মেয়েদের অমুসলিমদের বিয়ে করারও অনুমতি রয়েছে। দেশে ভি, সি, আরের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। সেনাবাহিনীর সদস্যরাই চোরাচালান ও অশ্লীলতা ছড়াতে বেশী ভূমিকা রাখছে।

হাফিজ আল-আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতাকে নুসাইরীকরণ করেছে। সেনাবাহিনী, প্রশাসন, সরকারের সকল ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নুসাইরী শিয়াদের বসানো হয়েছে। আসাদ তার উত্তরসূরী হিসেবে তার ভাই রিফাত আসাদকে গড়ে তুলেছে এবং তাকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদদেয়া হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল চাবিকাঠি এখন এই নুসাইরীদের দখলে।

সুতরাং একথা পরিস্কার যে, এককালের একটি সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের আজকের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক দৈন্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের যেমনি কালো হাত কাজ করেছে তেমনি দায়ী সিরিয়ার তাৎকালীন অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রলোভনে জাতীয়তাবাদের বটিকা সেবন করে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কামানের নল ঘুরিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্র এলাকায় প্রবেশ করার পথ করে দিয়েছিলো। যারা নিজেদের ভূ-খণ্ডকে স্বাধীন করার জন্য হাজার বছরের গড়া একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠাল মেরেছিলো।

[অসমাপ্ত]

মধ্যপ্রাচ্যসহ যে কোন দেশের ভিসার প্রসেসিং দ্রুত করার নিশ্চয়তা আমাদের অঙ্গীকার

ফমিরা ওভারসীজ

FAMIRA OVERSEAS

Recruiting Licence No.-RL-F-178

Phone Off-243561, 281067, 243567, 237346 Res. 418021
Tlx-632162 CONTL JB FAX-880-2-863379, 863170, 863317, 405853
8/2 Purana Paltan, North-South Road, Dhaka-1000
G. P. O. Box No. 854 Dhaka

ভারত কি বাংলাদেশকে অঙ্গরাজ্য মনে করে?

আব্দুল্লাহ আল–ফারূক

জাতি সাপের লেজে পা পড়লে জাতি সাপ যেমনি ফোঁস করে ফণা ধরে, তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ গত ২০শে জানুয়ারী এক দীর্ঘ আলোচনার পর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য এক নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভারত ওই সাপের মত ফোঁস করে উঠে। আন্তর্জাতিক সকল রীতি–নীতি ও ভদ্রতাকে উপেক্ষা করে আপত্তিকর ও অশালীন ভাষায় এদেশের সরকারকে হুমকি–ধমকি দেয় ভারতের নরসিমার ব্রাহ্মণ সরকার। বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন দেশ এবং এ দেশের সরকার যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, চানক্যরা তা' সম্পূর্ণ বেতোয়াক্কা করছে। লজ্জা–শরমের সকল পর্দা তুলে দিয়ে দাত বের করে জাহির করছে যে, আমি একখানা আগ্রাসী শক্তি, দক্ষিণ এশিয়ায় আমিই বড় মাতব্বর। আমার কাজের (তা' যত ঘৃণিত হোক) কেউ সমালোচনা করতে পারবা না—যেন উপমহাদেশের কারও এই বৈধ অধিকার নেই।। অবাধ্য হওয়ার চেষ্টার করলে তাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়া হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ গত ২০শে জানুযারী বাবরী মসজিদ ধ্বংসের নিন্দা এবং তা পুনঃনির্মাণের দাবী সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করলে ২৩শে জানুয়ারী ভারত সরকারের এক বেনামী মুখপাত্রের বরাত দিয়ে একটা অপমানজনক বিবৃতি সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমুহে প্রেরণ করে। সে বিবৃতিতে বলা হয়, "অযোধ্যায় একটি বিতর্কিত ভবন ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে ২০শে জানুয়ারী ১৯৯৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা' আমরা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ করেছি। আমরা সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি, আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একটি পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ। ....."

"... আমাদের নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করে যে নাক গলাচ্ছে এবং যে সব বিষয়ে তার আইনগত অধিকার নেই সেসব বিষয়েও আমাদের উপদেশ দেয়ার মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে সে বিষয়গুলো আমরা অত্যন্ত বিরূপভাবে দেখছি।....."

....."কথিত ঐ প্রস্তাবে বাংলাদেশে সংঘঠিত সহিংস প্রতিক্রিয়ার দরুন যে শত শত মন্দির ধ্বংস হয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ী–ঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেসব বিষয়কে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। ১৯৯২–এর ৭ ডিসেম্বর থেকে সংঘটিত নিপীড়নমূলক এসব ঘটনাবলী অবর্ণনীয় দুর্ভোগও মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে।...."

"....ভারত বাংলাদেশের সাথে শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধি–নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং বাংলাদেশ সরকারের ভবিষ্যত পদক্ষেপের ওপর মনোযোগের সঙ্গে নজর রাখবে।..."

"..... মৌলবাদী দেশগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশ বাবরী মসজিদ ধ্বংসের নিন্দা করেছে...."

বিবৃতিতে ভারত সরকার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বাবরী মসজিদকে একটা 'বিতর্কিত ভবন' বলে উল্লেখ করেছে। বক্তব্য পড়ে মনে হয়, তাদের দেশের একটা বিতর্কিত ভবন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তা নিয়ে তোমরা নাক গলাবার কে–ভারত সরকার এ মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে।

বাবরী মসজিদ একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। যে মসজিদের সাথে মুসলমানদের হৃদয়ের সম্পর্ক, সেই মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বিশ্ব মুসলিমের সাথে সাথে পাশ্চাত্যের খৃস্ট সমাজ পর্যন্ত উগ্র হনুমানদের মুখে ঘৃণার থুক্কার নিক্ষেপ করেছে, অথচ তাকে একটা 'বিতর্কিত ভবন' বলতে কাপালিকরা একটুও শরমবোধ করেনি। ওরা একতরফা ভাবে মুসলমানদের নিধন করবে, পুলিশ, সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেবে, ধর্মীয় এবাদতগাহ ভেঙ্গে ফেলবে, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদাটুকুও মুসলমানরা পাবে না, প্রশাসনে মুসলমান হওয়ার অপরাধে চাকুরী পাবে না, রাস্তায় দাড়ি রেখে টুপি পরে হাটতে পারবে না–তাহলে 'নেড়ে' গালি শুনতে হবে। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে স্পেনের স্টাইলে মুসলমানদের উৎখাত করে একটা নির্ভেজাল রাম রাজ্য কায়েম করার প্রক্রিয়া চলবে অথচ কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারবে না, তাদের এ উলঙ্গ ও পশুসুলভ আচরণের কেউ নিন্দা জানাতে পারবে না এটা করলে নাকি ওনাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হয়ে যায়। উগ্র আর্যরা বারবার ঘোষণা দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছে, নরসিমা রাওয়ের সরকার ইচ্ছে করেই তাদের বাধা না দিয়ে মসজিদ ভাঙ্গতে দিয়েছে। অথচ তারা এটাকে একটা 'ঘটনা' বলে বিবৃতিতে

উল্লেখ করেছে। মসজিদ রক্ষার ব্যর্থতার জন্য একটুও ব্যথিত ও লজ্জিত না হয়ে উল্টো বাংলাদেশের কতিপয় ভারত মাতার তকমা আঁটা বাঈজী ভারতের স্বার্থ রক্ষার ঠিকাদারদের গলায় গলা মিলিয়ে দাবী করেছে যে, এদেশের সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ধর্মীয় উপাসনালয়ের ক্ষতি করা হয়েছে, তাদের নিরাপত্তাহীনতার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কল্পিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা কোথায় কিভাবে নির্যাতিত হয়েছে তার কোন বিবরণ পেশ করার মুরোদ হয়নি। নরসিমার সরকার কয়েকমাস পূর্ব থেকে মসজিদ ভাঙ্গার প্রস্তুতি নিয়ে আসা কয়েক লক্ষ জঙ্গী হিন্দুকে বাঁধা দিতে পারেনি, পারেনি ওদের মহা তান্ডবকে নিয়ন্ত্রণ করতে। মসজিদ ভাঙ্গার পর এদেশে ভাবাবেগ আক্রান্ত ১০ কোটি মুসলমানের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল সমাজ বিরোধী স্থানে স্থানে সংখ্যালঘুদের সম্পদের ক্ষতি করে, কিন্তু জনগণের হামলা বা পুলিশের গুলিতে শত শত কেন একজন হিন্দুও নিহত হয়নি। অথচ ওনাদের চোখে এটা নাকি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। শক্তির জোড়ে কপালে ত্রিশুল আঁকা কাপালিকরা ভারতের মুসলমানদের দমন করে রেখেছে। প্রতিবেশী মুসলমানদেরও 'জ্বি-হুজুরে' পরিণত করে রাখার পাঁয়তারা করছে। দুর্বলের ওপর চাকুক চালাতে চালাতে ওদের মন মেজাজ জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এরই পতিফলন ঘটিয়েছে একটা স্বাধীন দেশের সরকারকে ধমকের সুরে কথা বলে।

আগে প্রতিবেশীদের সাথে এমন আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করত একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল। সম্প্রতি ইসরাইলের সাথে গলাগলি বাঁধার পর ভারতও সেই পথ ধরেছে ইসরাইল চায় একটা নিরঙ্কুষ ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করতে, ভারত চায় একটা রামরাজ্য কায়েম করতে। উভয়ের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে মুসলামনরা। তাই ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের পুশব্যাক করছে প্রতিবেশী দেশে, প্রয়োজনে গুলি করে মারছে। ভারতও মুসলমানদের একবার প্রতিবেশী দেশে পুশব্যাক করার মহড়া দিয়েছে, গুলি চালিয়ে পাখির মত মেরেছে অসংখ্য মুসলমানকে। সর্বোপুরি ভারত ও ইসরাইল রাষ্ট্রদ্বয়ের অভ্যুদয় ঘটেছিল একই সময়ে বেনিয়া ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে। সুতরাং যে ইসরাইল পারমানবিক জুজুর ভয় দেখিয়ে প্রতিবেশীদের প্রতি নিয়ত হুমকী দেয়, তার যোগ্য সহযোগী ভারতের কোচরে কয়েকখানা পারমানবিক অস্ত্র থাকতেও যে প্রতিবেশীদের অবাধ্যতা (?) নীরবে হজম করবে এমনটা কল্পনা করাও কষ্টকর নয় কি?

কিন্তু তবুও ভারতের ঘৃণিত আর্য শাসকদের জেনে রাখা উচিত, পৃথিবীর সর্বত্র একই সময় একই ঋতু বয় না, একই চানক্য নীতির দ্বারা উভয় মেরুর মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আজকের সোভিয়েত ইউনিয়ন। সম্রাজ্যবাদী শ্বেত ভল্লুকেরা রক্ত চক্ষু দেখিয়ে পুরো পূর্ব ইউরোপ দখল করলেও একই নীতির দ্বারা আফগান ভূমি দখল করতে এসেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি পৃথিবীর সবচেয়ে সরল-সহজ মানুষদের মোকাবিলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, হারিয়ে ফেলে নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত।

তাই দাদাবাবু ও ঠাকুর মশাইদের একটু ঠান্ডা মাথায় ইতিহাসের দিকে নজর দিতে বলছি। অতীতের পারস্য, রোম, মঙ্গল, তাতার সাম্রাজ্যের কথা না হয় বাদ দিলাম। চলতি শতকের জার্মান ও জাপান জাতি দুটি বিশ্ব মোড়ল সাজতে গিয়ে পর পর দুবার কি চ্যাং দোলাটা না খেলো। ভারতও যেন তেমন হিটলারী ভূতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীফ ঠাউরে না বসে। বিশাল দেহীহাতি যখন উন্মত্ত হয়ে উঠে তখন সে শক্তির দম্ভে এত বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে সামনের সকল প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে মত্ত হয়। অবশেষে পাকা শিকারীর খুড়ে রাখা সামান্য একটা গর্তে পড়ে তার বাহাদুরীর ইতি ঘটে, তার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়। দাদাবাবুরাও নিশ্চয় বুঝতে চেষ্টা করবেন, হাতির মত অতিরিক্ত উন্মত্ত হওয়া নিজের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। আপনারা যে মৌলবাদীদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। আফগানিস্তানের যে মৌলবাদী মোল্লাদের উত্থানকে রাশিয়ার সাথে মিতালী করে আদা জল খেয়ে চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারেননি, কাশ্মীরী মৌলবাদীদের ঠেকাতে আপনাদের মাথা চিন্তায় হাটুতে গিয়ে ঠেকেছে! আপনাদের আনাড়ী পনার জন্য কিন্তু সেই মৌলবাদীদের উত্থান এদেশেও ত্রুত ঘটে গেলে শেষে কারবালার মাতম করেও শোধরাতে পারবেন না। আর জানেন তো, মৌলবাদীরা যখন জাগে তখন সমস্ত ইজম, তন্ত্র-মন্ত্রের তাবিজ-কবজ ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে, থোরাই কেয়ার করে দাম্ভিক শক্তিকে। দেখলেন না আপনাদের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত দরিদ্র, কত দুর্বল এই দেশ, তারপরও লংমার্চে লাখো লাখো মুজাহিদ শরীক হয়ে শাহাদাৎ আঙ্গুলী উঁচিয়ে আপনাদের কি বলে এলো? জানেন, ওদের বুকের পাটা কত লম্বা? আপনারা গজ-ফিতে নিয়ে মেপে ওদের বুকের পাটার পরিধি পরিমাপ করতে পারবেন না। এই লংমার্চ থেকে আপনাদের অনেক কিছু শেখার আছে। মনে রাখবেন, সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মদ ঘোরী, আহম্মদ শাহ আবদালী, তৈমুর লং, চেঙ্গিস খানের বংশধর জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুরেরা শুধু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ধাবিত হয়েছিল বলেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তাদের বিপ্লবী রক্তের ধারা পূর্ব দিক থেকেও প্রবহমান। প্রয়োজনে নব্য বাবর , মাহমদু, আবদালীরা তাদের দুর্ধর্ষ ঘোড়াগুলিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমেও ধাবিত করতে সক্ষম। এর ক্ষেত্র কিন্তু আপনারাই তৈরী করছেন। সেজন্যধন্যবাদ।

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

আল্লাহর সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি

(হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর জম্মু কাশ্মীরের নায়েবে আমীর আমজাদ বেলাল সাহেব ১৯৯১ সনের নভেম্বর মাসে অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। সেখানে সুদূর্ঘী এক বছর অবস্থান করে কিছু দিন পুর্বে তিনি পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন। কাশ্মীরে তিনি কিভাবে গেলেন, সফরে কি কি সমস্যায় পড়েছেন, সেখানকার মুসলমানদের মানসিকতা কি, সেখানে ইণ্ডিয়ার সৈন্যরা কিভাবে ক্রেক ডাইন করে, তিনি কিভাবে সৈন্যদের বেষ্টনী থেকে বেড়িয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র যে সব মদদ তিনি নিজ চোখে দেখেছেন তার ঈমানদীপ্ত বিবরণ এই লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তার এই ঘটনাবহুল এক বছরের ইতিহাস আমরা তার জবানীতেই হুবহু পেশ করছি। তবে নিরাপত্তার সার্থে কিছু লোক ও স্থানের নাম গোপন রাখা হয়েছে।)

আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমতে আমি বেশ কয়েক বছর আফগান জিহাদে শরিক ছিলাম। সেখানকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণকরার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

ছাত্র অবস্থায় আমার মনে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার আগ্রহ জাগে। আর সেই প্রেরণায়ই আমি ঘর ছেড়ে হাজার মাইল দুরে আফগান জিহাদে অংশ নেই। সেখানে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ লাভের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সংগঠনে যোগ দেই। ১৯৯১ সালের নভেম্বরে হরকাতুল জিহাদের গ্রুপ কমাণ্ডার হিসেবে আমাকে কাশ্মীরে পাঠান হয়। এর পূর্বে এক অপারেশনে আমি আহাত হই তা থেকে পরিপুর্ণ সুস্থ না হওয়ায় হরকাতের চীপ কমাণ্ডার আমাকে আরো কিছু দিন বিশ্রাম করার পর রওয়ানা হওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু সাথীদের জওক ও শওক দেখে আমার আর বসে থাকতে ইচ্ছ হল না। চীফ কমাণ্ডারকে বারবার অনুরোধ করে অনুমতি আদায় করে নিলাম।

আমাদের গ্রুপে মোট একত্রিশজন মুজাহিদ এর মধ্যে 'আল বরক' নামক একটি সংগঠনেরও বেশ কিছু মুজাহিদ ছিল। এদের সকলের জিম্মাদারী আমার উপর ন্যাস্ত করা হয়। আমাদের গ্রুপের পূর্বে আরও চারটি গ্রুপ আজাদ কাশ্মীর থেকে অধিকৃত কাশ্মীরে রওয়ানা হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের পাহাড়া এড়িয়ে পথ তৈরি করতে না পারায় তারা ফিরে এসেছে। আমরা ১৮ই নভেম্বর পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে রওয়ানা হলাম। আমরা একত্রিশ জনের মধ্যে ত্রিশজনই ছিলো অধিকৃত কাশ্মীরের। একমাত্র আমি ছিলাম আজাদ কাশ্মীরের। নির্যাতিত মুসলমান ভাইদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র অবস্থায় দুর্গম পাহাড়ী পথে রওয়ানা হলাম।

অধিকৃত কাশ্মীরের সীমান্তে প্রবেশের পর আমাদের চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। সাধারণত এই পাহাড়ে উঠতে দশ ঘন্টার মত সময় লাগে। আমরা দ্রুততার সাথে চলে সাত ঘন্টায় সেখানে উঠি। রাস্তায় অনেক আশ্চার্য্য ঘটনা ঘটে এবং আল্লাহর সাহায্য নিজ চোখে অবলোকন করি।

আল্লাহর প্রথম সাহায্য

সন্ধ্যার পরে আমরা সফর শুরু করি। রাত দুটার দিকে আমরা সোজা পূর্ব মুখো হয়ে সফর অব্যাত রাখি। চলতে চলতে আমরা ভারতীয় সৈন্যের দুটি পোষ্টের মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকে পড়ি। দুই পোষ্টের ব্যবধান বড় জোর দুশ মিটার। মাঝখানে একটি তার ঝুলানো। তাতে টিনের ঘন্টি বাঁধা। যাতে করে কেউ মাঝখান থেকে অতিক্রম করলে তারের টানে ঘন্টিটা বেজে উঠবে এবং দুপাশের পোষ্টের সৈন্যরা কারও উপস্থিতি বুঝতে পারবে। আমি অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ইশারায় সাথীদের বসে যেতে বল্লাম এর পর তৎক্ষণাৎ সীদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, আর পিছু হটা যাবে না সামনে পিছনে সমান বিপদ, যেভাবে হোক সামনে এগোতেই হবে। সবাইকে অবস্থা বুঝিয়ে বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি।

দুশমনরা অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ছিলো। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কখন তারা হামলা করে। ইতিমধ্যে আমরা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পোষ্টের আওয়াজ শুনতে পাই। সেখান থেকে নিকট বর্তী পোষ্টের কমাণ্ডারকে ওয়ারলেসে বলতেছে, মনে হচ্ছে আমাদের পোষ্টের মধ্যে দুশমনরা ঢুকে পরেছে।

নিকটবর্তী পোষ্টের কমাণ্ডার জওয়াবে বল্লো, না তেমন তো কিছু দেখছি না। আর এর মধ্যে কার ঢুকতে সাহস হবে?

দূরবর্তী পোষ্টের কমাণ্ডার বল্লো, ভাল করে দেখো আমার মনে হয় কিছু দেখতে পাচ্ছি।

অপর কমাণ্ডার দৃঢ়তার সাথে তার ধারণা খণ্ডন করলো।

তারা ঠিকই আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লড়াই করতে রাজী ছিল না। সম্ভবতঃ তারা মনে

করেছিল, এত সাহস নিয়ে যারা এ পর্যন্ত এসেছে তাদের উপর আঘাত করলে পাল্টা আক্রমণ অবশ্যই হবে। এই মধ্যরাতে তাদের এতবড় ঝুকি নেয়ার সাহস ছিলো না। আমরা অর্ধ ঘন্টা অবস্থানের পরও দেখলাম, তারা আমাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। অতঃপর একটা লাঠির সাহায্যে তার উঁচু করে ধরে নিচ দিয়ে একে একে ক্রোলিংকরে আমরা সবাই বেরিয়ে আসি।

আমাদের সহযোগী গ্রুপের অন্য দলের সাথীরা দ্বীনের ব্যাপারে তেমন ধারণা রাখত না, এমন কি নামাজের ব্যাপারেও তারা গাফেল ছিল। আমি আস্তে আস্তে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কুদরতের বর্ণনা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করি। পথিমধ্যে যখনই আমরা বিশ্রাম নিতাম বা নামাজের সময় হত সবাইকে নামাজের তালকীন দিতাম। আলহামদু-লিল্লাহ আমাদের কাফেলার সকল সাথী পথিমধ্যে পাকা নামাযী হয়ে যায় এবং তারা আমার সাথে ওয়াদা করে, তারা কখনও আর নামাজের ব্যাপারে গাফেল হবে না।

আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় সাহায্য

তীব্র শীত শুরু হওয়ার পূর্বে আমাদের কাফেলাই ছিল সর্বশেষ কাফেলা বরফপাতের জন্য আগামী ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় কোন কাফেলার কাশ্মীরে প্রবেশ সম্ভব হবে না। এসময় সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের সংখ্যাও ছিল বেশী। তারা গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বদা কাফেলার আগমনের সংবাদ জানার চেষ্টা করত। আমাদের আগমনের খবর তারা পূর্বে পেয়ে যায়। একশত চল্লিশজন সৈন্যের ইণ্ডিয়ান সৈন্য গ্রুপ আমাদের পথে ওৎপেতে থাকে। তারা পাহাড়ের এমন দুটি চূড়ায় অবস্থান নেয় যার মধ্য থেকে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় ছিলো না। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, দুশমন আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এমন কঠিন অবস্থায় লড়াই করাও যুক্তি সংগত নয়। অতএব আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নুতন কৌশল অবলম্বন করলাম।

প্রতিটি সাথীকে বললাম, তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে অমুক পাহাড় পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসবে। এভাবে একজন মুজাহিদ চার পাঁচবার করে আসা যাওয়া করবে। আল্লাহ্‌র রহমেত আমরা এই কৌশলে দুশমনকে ধোকায় ফেলতে সক্ষম হই। তারা গুপ্তচর থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের এক গ্রুপের খবর পেয়েছিল। এবার আমাদেরকে তারা মনে করলো কয়েকশ মুজাহিদের বিরাট এক কাফেলা। অতএব ভীত সন্তস্ত হয়ে বিনা যুদ্ধেই তারা ময়দান ত্যাগ করে। আট দিন সফরের পর আমরা কাশ্মীরের এক গ্রামে পৌছি। সেখান থেকে আল বরক গ্রুপের মুজাহিদরা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিজ এলাকায় চলে যায়। আমরা মারকাজের নির্দেশের অপেক্ষায় এখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেই।

সাত দিন পর্যন্ত আমরা এই গ্রামে অবস্থান করে আমাদের আমীরের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালাই। কিন্তু তার সাথে কোন যোগাযোগ কায়েম না হওয়ায় আমরা আরো দুদিন সফরের দুরত্বের এক গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রোগ্রাম মোতাবেক সেই গ্রামে উপস্থিত হই। সেখান থেকে শ্রীনগর, সোপুর ও কাপুয়ারার দিকে দুইটি পথ চলে গেছে। আমার কাশ্মীরী সাথীরা অনেক দিন পাকিস্তান ছিল এবং এই অবস্থায় আমীরের সাথে যোগাযোগ না হওয়ায় তারা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে। আমার কাছে বার বার ছুটির অনুমতি চাইতে থাকে। অনেক দিন ধরে পিতা মাতা ভাইবোনদের সাথে তাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ীর প্রতি তাদের টান সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে সকলকে নির্দিষ্ট শর্তে ছুটি দিলাম। শুধু মাত্র একজন মুজাহিদ আমার সাথে থেকে গেল। যাওয়ার সময় বার বার তারা আমাকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। আমি মারকাজের গাইড লাইনের উপর চলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে অনুরোধ জানাই।

আমার সাথীরা শ্রীনগর সোপুরের পথ ধরে চলে গেল। একজন গাইড সাথে নিয়ে আমরা আমীর সাহেবের নিকটবর্তী এক গ্রামে পৌছি। এখানে একমুজাহিদের ঘরে আমি অবস্থান নেই। সেই মুজাহিদ অন্য গায়ে অবস্থান করতো। পাঁচ দিন অবস্থানের পরও আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম না। এদিকে সর্বত্র প্রচার হয়েছে যে, এই গ্রামে একজন আফগান মুজাহিদ এসেছে। ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা তাকে ধরার জন্য পঞ্চম রাতে সমগ্র গ্রাম ঘেরাও করে। রাতের পর সকালে গ্রামেব্যাপী ক্রেক ডাইন হবে।

ক্রেক ডাইনের সময় সমগ্র গ্রাম ঘেরাউ করে কার্ফ্যিউ জারী করা হয়। এর পর প্রতিটি ঘর থেকে পুরুষ, মহিলা, শিশু বৃদ্ধদের বের করে এক মাঠে জমা করা হয়। তার পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়। যাতে করে কেই লুকিয়ে থাকতে না পারে। মাঠের মধ্যে একে একে সবার পরিচয় যাচাই করে দেখে—কোন মুজাহিদ বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি আছে কিনা। এই সব ক্রেক ডাউনের সময় যেসব অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় তার বর্ণনা ভাষাতীত। গ্রামের লোকেরা সবাই আমাকে জানতো, তারা এসে বল্লো, "ভাইসাব! ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। ভোরেই ক্রেক ডাউন হবে, আপনি যেভাবেই হোক আত্মরক্ষা করুন।

আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে আমার দুজন মুসলমান বোন ছিল। যারা আমাকে ভাই বলে ডাকতো। তারা এসে বল্লো, ভাইজান আপনি অপেক্ষা করুন আমরা রাতের আধারে অবস্থা পর্যবেক্ষন করে আসি। দেখি বের হওয়ার কোন রাস্তা বের করা যায় কিনা? তারা ঘন্টাখানে পর এসে বল্লো, সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে বেষ্টনী তৈরী

করেছে, প্রতি পাঁচ মিটার অন্তর একজন সান্ত্রী পাহাড়া দিচ্ছে। তবে এক যায়গায় পানির নালা আছে তার দুপাশের পাহারাদার দ্বয়ের মাঝখানে একটু বেশী ফাঁক দেখা যায়। যদি এর মধ্য দিয়ে বের হতে পারেন তাছাড়া বের হবার বিকল্প কোন পথ নেই। দুই সৈন্যের মধ্য দিয়ে বের হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। আমি ক্লাসিন কভ লোড করে শরীরের উপর কোট চাপিয়ে টুপি খুলে সেই দিকে রওয়ান হলাম। পথে পথে অনেক দোয়া পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে গায়েবী সাহায্য তলব করলাম। আমার ক্লাসিন কভ লোড করা ছিল। যদি ধরা পরার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে ওদের ওপর সোজা গুলি করব। শাহাদাতের পূর্বে যে কজন নিয়ে যেতে পারি তাই লাভ। আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আস্তে আস্তে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলাম। অন্ধকারে আমার কোর্টের চমক দেখে সৈন্যরা ধোকায় পড়ে যায়। তারা আমাকে তাদের অফিসার মনে করে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন স্যার! আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা ধোকায় পড়েছে। দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, "আমি পেসাব করে আসছি এদিকে খেয়াল রেখ।" কারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নয় যে মুজাহিদ এত সাহসী হতে পারে এবং ক্লাসিন কভ হাতে নিয়ে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে এভাবে অতিক্রম করতে পারে। আমি গ্রাম থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠি। সেখানে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি।

সকাল হতেই ভারতীয় সৈন্যরা গুপ্তচরের সাথে গ্রামে ঢুকে পড়ে। আমি একটা ঝোপের আড়াল হতে গ্রামের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সৈন্যরা ঘরে ঘরে যেয়ে সকল জোয়ান, বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে টেনে টেনে এক মাঠে জমা করে। মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন তাদের আনন্দের উপকরণ। যে ভাবে তাদেরকে একত্র করলো ও যে ভাবে তাদের সাথে হিংস্র পশুর মতন ব্যবহার করলো তা দেখে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। যার যার ঘরে আমি থাকতে পারি বলে সন্দেহ হল সবার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল,। সবার কাছেই তাদের এক পশ্ন, কোথায় সেই আফগান মুজাহিদ?

আমার জীবন এই সকল সম্মানী গ্রামবাসীর জন্য নিবেদিত যাদের উপর এত জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও তারা আমার সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি।

ইতিপূর্বে এরা অনেক বার আমাকে বলেছে, পুরো গ্রাম শেষ হতে পারে। আমরা সব কিছু কোরবানী দিতে পারি। কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হোক তা আমরা বরদাস্ত করবো না। যে কোন ভাবেই হোক আপনাকে হেফাজত করবই। আপনি আমাদের মেহমান। আপনি আমাদের মুক্তির মহান দূত। ভাতরীয় সৈন্যরা দুপুর নাগাদ ঘেরাউ তুলে গ্রাম থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় চারজন নওজোয়ানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সৈন্যরা চলে যেতেই গ্রামের লোকেরা আমার তালাশে বের হয়, সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে আমাকে খুঁজতে থাকে। বেলা দুটোর দিকে আমি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসি। আমাকে জেন্দা দেখা মাত্র সারা গ্রামের লোক একত্র হয়ে আমাকে মোবারকবাদ জানাতে থাকে। কেউ চুমা খেতে থাকে কেউ বুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। যেন তাদের সকল দুঃখ সকল নির্যাতনের বিষাদ আমাকে জেন্দা পাওয়ার আনন্দে ভুলে গেছে। যে চারজন গ্রামবাসীকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা যদিও মুজাহিদ ছিল না কিন্তু তারা আমার সম্বন্ধে ভালভাবে জানতো। আমার ভয় হচ্ছিলো, যদি নির্যাতনের মুখে তারা আমার খবর এবং যে ঘরে আমি থাকি তা তাদের বলে দেয় তবে অবস্থা খুবই কঠিন হবে। *[চলবে]*

সৌজন্যেঃ আল ইরশাদ

অনুবাদঃ ফারূক হাসান

সাধারণ শিক্ষিতদের পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্সে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার

এক ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ

- বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য
- আদর্শ আবাসিক হিফজখানা
- বাংলাদেশ নাদিয়াতুল কুরআন-এর কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত আদর্শ মকতব

ভর্তি প্রতি বছর ১০ই শাওয়াল থেকে

জামাআত বিভাগে ভর্তির শর্ত কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে এস, এস, সি, উত্তীর্ণ

যোগাযোগ

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ

সেকশন-১২, ব্লক-ই, মীরপুর, ঢাকা

ফোনঃ ৮০৩১৬৩

হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)—এর মনোনীত কাহিনী

এক ডেপুটি কালেক্টর ও দরবেশের কাহিনী

জনৈক ডেপুটি কালেক্টর এক দরবেশের দরবারে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ প্রাপ্তির অতি সহজ পথ কি? এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে দরবেশ সাহেব সরাসরি এর জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তিনি তাঁকে বলেন, বাড়ীর সকলে ভালো? ছেলে মেয়ে ভালো আছে? বর্তমানে কতটাকা বেতন পাচ্ছেন? দিন-কাল কেমন চলছে? কেস-মোকাদ্দমা কোন পর্যায়ে আছে?

আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে দরবেশ সাহেব তাঁর নিকট জানতে চাইলেন, প্রথমে স্বল্প বেতন থেকে বর্তমানে বড় অংকের বেতন প্রাপ্তি এবং চাকুরীর নিম্নস্তর থেকে বর্তমান উঁচুস্তর পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে কত সাধনা ও মেহনত করতে হয়েছে? একথা জিজ্ঞাসা করলে ডেপুটি সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দরবেশ সাহেবকে তাঁর চাকুরী জীবনের ক্রম উন্নতির সব কথা বিস্তারিত বলে শুনান। তিনি বলেন, প্রথমে আমি খুব অল্প বেতনের চাকুরীতে যোগদান করি, আমি ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর একজন কর্মচারী। এই সময় আমার বেশ কিছু কাজে যথেষ্ট সুনাম হয়। ক্রমে আমি উন্নতি করতে থাকি। বর্তমানে আমি প্রথম শ্রেণীর পদে চাকুরীর করছি। বহু সময় ও কঠিন সাধনার পর নিচ থেকে উপরে উঠেছি। বর্তমানে পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমি পেনশন ভোগ করছি।

অতঃপর দরবেশ সাহেব তাঁকে বলেন, সব কাজে উন্নতির নিয়ম হলো, নিচ থেকে উপরে উঠা। আপনার মনে খোদা প্রাপ্তির যে আকাংখার সৃষ্টি হয়েছ তা খুবই ভালো কথা এবং আপনি অবশ্যই মনে করেন যে, ডেপুটি কালেক্টরের পদের চেয়ে খোদা প্রাপ্তির কাজ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। ডেপুটি সাহেব বল্লেন, জি হ্যাঁ অবশ্যই খোদা তলবীর চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে!

এবার দরবেশ সাহেব তাঁকে বল্লেন! ডেপুটি সাহেব! আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথকে ডেপুটি কালেক্টরের পদ ও কাজের চেয়ে আপনি উত্তম মনে করেন ঠিকই কিন্তু এই সামান্য ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হতে কত দীর্ঘ সময় আপনার প্রয়োজন হয়েছে। আমার দুঃখ হয় এবং আপনার লজ্জা করা উচিত, সেই আপনিই আল্লাহ্ প্রাপ্তির সন্ধানে কত ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন এবং অল্প সময়ে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হওয়ার আকাংখা প্রকাশ করছেন।!

উল্লেখ্য যে, যে কাজ যে পর্যায়ের তা সাধন করার পথও তত কঠিন ও কষ্টবাধ্য হয়ে থাকে। একটি সাধারণ চাকুরী পাওয়ার জন্য জীবনে যতটুকু কষ্ট করতে হয় একটি বড় পদের চাকুরীর জন্য তার চেয়ে বহু বেশী কষ্ট করতে হয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এটাই উন্নতির ধারা ও নিয়ম।

আযাচিত মেহমান হওয়ায় অভ্যস্ত এক কবির কাহিনী

খাওয়ায় খুব রুচী ও পটু এক কবিকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত এবং দুয়াটি তোমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে? কবি বলেন, 'কুলু ওয়াশরবূ' (খাও ও পান কর)। আর দুআর মধ্যে, 'রব্বানা আনযিল আলাইনা মায়িদাতাম মিনাস্সামায়ি' (হে আমাদের প্রতি পালক! আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাদ্যের খাঞ্চা অবতীর্ণ কর)।

উল্লেখ্য যে, আমাদের অবস্থাও এমন যে সমগ্র কুরআনের যেখানের যে অংশ পছন্দ হয় সেটুকু গ্রহণ করি। অথচ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই। এতে আল্লাহ্র কালামের এতটুকু পরিবর্তন ঘটে না এবং যা সম্ভবও নয়, যখন এর তত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধিতে আসবে তখন বুঝবে, কত ভুল ও ভ্রান্তির মধ্যে পূর্বের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। যেদিন একটি সামান্য পাপের জন্য কৈফিয়ত তলব করা হবে সেদিন লা-জবার হয়ে এ কথা বলা ছাড়া কি উপায় থাকবে যে, আপনার করুণাই পার হওয়ার একমাত্র ভরসা!

জাহেল আবেদের ঘটনা

আমাদের এলাকার 'খাইল' নামক বস্তিতে এক জাহেল লোক বাস করত। লোকটি ছিলো জাহেদ ও এবাদত গুজার। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করত। লোকেরা তাকে ভক্তি করত, ভালোবাসত এবং বুজুর্গ হিসাবে শ্রদ্ধা করত। এই মহল্লায়ই নেজামুদ্দীন নামক ভাঁড় প্রকৃতির এক লোক থাকত। এই বুজুর্গের প্রতি তার সুধারণা ছিলো না মেটেই। লোক যখনই এই আবেদকে তার সামনে বুজুর্গ বলে অবহিত করত তখনই সে এর প্রতিবাদ করে বলত, জাহেল আবার বুজুর্গ হয় কিভাবে! এ কারণে নেজামুদ্দীনকে প্রায়ই মানুষের গাল মন্দ শুনতে হত।

একদিন বুজুর্গ ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্য উঠলে ভাঁড় লোকটি তার বাড়ীর ছাদের ওপর উঠে দুষ্টামি করে অত্যন্ত চিকন ও নরম সুরে বুজুর্গকে ডাকতে থাকে। বুজুর্গ উত্তরে বলে, কে? ভাঁড় বলে, আমি জিবরাঈল! আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছি। তুমি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছো এবং এখন শীত মওসুম—রাতে ওঠে ওযু করতে তোমার যথেষ্ট কষ্ট হয়। এতে আল্লাহ্র লজ্জা হয়। যাও এখন থেকে তোমার জন্য সব নামায মাফ করে দেয়া হলো। এ কথা শুনে জাহেল আবেদ ভীষণ খুশী হয় এবং উঠে গিয়ে আরামের সাথে বিছনায় শুনে পড়ে ও

যায়। আনন্দের গভীর নিন্দ্রায় তার ফজরের নামায চলে যায়। ফজরের নামাযে তার অনুপস্থিতির কারণে অন্যান্য মুসল্লিরা মনে করে যে, হয়তো তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। যে কারণে ফজরের জামাতে হাজির হয়নি। কিন্তু এর পরের ওয়াক্তেও সে আসল না। এভাবে কয়েক ওয়াক্ত তাকে মসজিদে অনুপস্থিত দেখে মহল্লার লোকরা চিন্তিত হয়ে তাকে দেখতে আসে। তারা যেয়ে দেখে, বুজুর্গের চেহারা হাসি খুশীতে উজ্জল এবং আরামে চকির ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছে।

দর্শনার্থীরা জিজ্ঞাসা করল, মিয়াজি স্বাস্থ্য কেমন? বল্লো, খুব ভালো। তারা বল্লো, নামাযে আসছেন না যে? এবার দরবেশ আয়েশ করে জবাব দেন, ভাই জীবনে বহু নামায পড়েছি, খোদা আমার সবকিছু কবুল করে নিয়েছেন। নামায পড়া দ্বারা আমার যা উদ্দেশ্য ছিলো তা আমি পেয়ে গেছি। এখন আমার নিকট ফেরশতা আসে, তারা সরাসরি আমার সাথে চেতন অবস্থায় কথা বলে। গত পরশু এক ফেরেশতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে পয়গাম দিয়ে যান যে, আল্লাহ্ আমার জন্য সকল নামায মাফ করে দিয়েছেন।"

এই সময় ওই জাঁদরেল ভাঁড় দূরে বসে সব দেখতে ও শুনতে ছিলো এবং বুজুর্গ এ কথা বলায় সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চি ৎকার করে বলতে থাকে, এবার জাহিলের বুজুর্গি ঠাওর করতে পেরেছ সবাই! সবাই ধমকের সুরে ভাঁড়কে বল্লো, বে ওকুফ, চিৎকার করে বেচারার সব বুজুর্গি পণ্ড করে দিলে!

উল্লেখ্য যে, এতো মাত্র একজন জাহেলের ঘটনা। যার ঘটনা শুনে তাকে মুর্খ ও খারাপ মনে হয়। কিন্তু আশ্চায্য হয়, আমরা একে নিয়ে হাসছি–নিজেদের অবস্থা অবলোকন করছি না। আমাদের অনেকেরই অবস্থা এ লোকটির চেয়ে মোটেও ভালো নয়। এমন লোকের সংবাদও আমাদের জানা আছে, যে আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখার জন্য চারদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। এর চেয়ে অজ্ঞাতা আর কি হতে পারে?

এক ছাত্রের অবাস্তব আকাংখা

একজন ছাত্র দারিদ্রের কারণে লাগাতার উপবাস করত এবং এক শাহজাদীকে বিবাহ করার ব্যাপারে তার মনে বদ্ধমুল প্রতিজ্ঞা ছিল। তার কল্পনায় সার্বক্ষণিকভাবে এই একটি বিষয়ই ঘুরপাক খেতে থাকে। এছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতেও পারে না।

ধীরে ধীরে তার চাল–চলন ও কথা বার্তায় তার প্রেম–ভাবুকতার বিষয় প্রকাশিত হতে থাকলে জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি যেন কার মিলন আকাংখায় অধীর অপেক্ষা করছো। ছাত্র বল্লো, হ্যাঁ যাকে ভাবছি তাকে পাওয়ার জন্য অর্ধেক কাজ সমাপ্ত করেছি, অর্ধেক বাকী আছে মাত্র। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, সে বাকী অর্ধেক কি? ছাত্র বল্লো, শাহজাদীকে বিবাহ করতে আমি সম্পূর্ণ রাজী কিন্তু শাহজাদী মোটেই রাজী নয়। অর্থাৎ বিবাহে দুটি জিনিস প্রয়োজন হয়, এক, মেয়ে পক্ষের সম্মতি, দুই, ছেলে পক্ষের তাকে বরণ করে নেয়া। যাকে বলা হয় ইজাব ও কবুল। আমি তাকে বরণ করে নিতে আগ্রহী কিন্তু আমার ঘরে বউ হয়ে উঠতে তার মোটেই সম্মতি নেই। সমস্যা মাত্র এতটুকু।

উল্লেখ্য যে, আখেরাতে মুক্তির ব্যাপারে আমাদের অবস্থাও অথৈবচ। জান্নাতে প্রবেশের আকাংখা বুক ভরা, কিন্তু প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির প্রস্তুতি মোটেই নেই। আমাদের আছে আকাংখা, বাকী থাকে আল্লাহ্‌র অনুমতির অপেক্ষা। এই হলো আমাদের অবস্থা। মনে রাখতে হবে, শুধু কথার ফুলঝুরি ও বাস্তবতা শূন্য আকাংখা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না।

সংকলনঃ আবুল হাসান আজমী

অনুবাদঃ ম, আ, মাহদী

বাংলা ভাষার ইতিহাস

(৩২ পৃঃ পর)

তাইতো প্লেটো তার লেখার কোথাও ভারত কিংবা ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি এবং ইতিহাসের জনক বলে কথিত হিরোডটাস তার ইতিহাস গ্রন্থে বাংলা–ভারত বর্ষের কোন বর্ণনা দিতে পারেননি। অথচ ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে যেমন আরবজাতি সম্পর্কিত আলোচনায় ভরপুর রয়েছে তেমনি প্রাচীন আরব্য ঐতিহাসিক উপাদান সমূহে বাংলা ভারত সম্পর্কিত প্রচুর তত্ত্ববিদ্যমান রয়েছে।

স্যার উইলিয়া জোনস তাঁর Discourse on the Arabia নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতবর্ষে কতকগুলা বিশেষ নামের সাথে আরবী নামের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন আরাবিয়ান নামক নদী আরাইসব্ বা আরবিস নামক জাতি এবং অপর শব্দ বাণিজ্য কেন্দ্র সাবাইয়ার অনুকরণে সারা আরব ভুগোলবিদগণের সাফারাত অনুকরণে সুপরো বা সুপারা ইত্যাদি।

এছাড়া ঢাকার অদূরে সাভার অঞ্চলটিও আরবদের দেয়া নাম বলে জানা যায়। এই সাভারেই প্রাচীনকাল থেকে সুক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত হত এবং এখান থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানী হত।

মুসলিম অভিযানের পূর্ব থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরব্য মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠে। সওদাগরেরা ব্যাপক হারে সমুদ্র পথে বাংলা ভারত ও চীন দেশে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড জোরদার করে। আরবরা যে দেশে যেতো সে দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাসের মাধ্যমে সে দেশের বাসিন্দা হয়ে যেতেন।

ডাঃ রবার্টসন বলেন, এসময় এতদাঞ্চলের বড় সকল বন্দরের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারতো। তিনি আরো বলেন, ক্যান্টন শহরে আরবরা এত অধিক ছিল যে, তাদের অনুরোধে চীন সম্রাট তাদের মধ্য হতে একজন কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করে দেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, যদি এসব অঞ্চলে পূর্ব থেকেই আরব বংশোদ্ভুত লোকদের বসবাস না থাকতো তাহলে নবাগত আরবগণ এদেশে এসে এত সহজে জনগণের সাথে মিশতে সক্ষম হতো না।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, বাংগালী জাতি প্রকৃত পক্ষে আরব জাতিরই উত্তরসূরী। অন্য কথায় আবর জাতিই হলো বাংগালী জাতির পূর্বপুরুষ।

বাংগালী জাতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃত ইতিহাস

ফজলুল করীম যশোরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সুতরাং পূর্বে আমরা যে হরপ্পা মহেনজোদারো সভ্যতাকে মানব জাতির আদি নিবাস এবং প্রথম কালের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছি তা কিছুতেই অযৌক্তিক নয়। হরপ্পা মহেনজোদারোর দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শুধু একটি কথাই বলে রাখা প্রয়োজন, তা হল, জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে আধুনিক বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের থিওরী ততই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তারা যে আদি যুগের মানুষকে অসভ্য বর্বর বলে উল্লেখ করে থাকে তা দিন দিন জলন্ত মিথ্যা ও পাগলের প্রলাপ বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ইতিহাসের আলোকে দ্রাবিড় সভ্যতাঃ করাচীর ২০০ মাইল উত্তর পূর্বে সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত রয়েছে দ্রাবিড় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি মহেনজোদারো এবং সিন্ধু উপনদীর তীরবর্তী, প্রাচীন ধারার বাম তীরে পাঞ্জাবের একটি শহরের নাম হরপ্পা।

১৯২২ সাল থেকে ৬৮ বছর যাবত অনবরত খনন কার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে সব নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে,২৫০০ খৃষ্ট পূর্ব থেকে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী ১০০০ বছর ধরে বিদ্যমান এ সভ্যতা ছিল মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সম পর্যায়ের।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো জানা যায় যে, তাদের দৈহিক গঠন ছিল ইথিওপিয়, সোমালিয়, ইয়েমেন, দক্ষিণ আরব ও দক্ষিন ভারতের তাম্রবর্ণ বাসিন্দাদের অনুরূপ। তাদের পোষাকাদিও ছিল অত্যন্ত রুচিসম্মত, এমনকি তাদের কাঁজ করা পোষাক পরিধানেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এদু'টি শহরের নির্মাণ পদ্ধতি ও আকার আকৃতিও ছিল প্রায় একই ধরণের। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে ধংসপ্রাপ্ত হলেও এখনো মহেনজোদারো নগরীতে লম্বালম্বিভাবে ৩টি এবং আড়াআড়িভাবে নির্মিত ২টি সমান্তরাল সড়ক নজরে পড়ে। এ পাঁচটি সড়কের প্রত্যেকেটিই ৩০ ফুট প্রশস্ত। এ সড়কগুলোর পাশে ছিল সারিসারি দালান কোঠা। সড়ক ও গলির নিম্ন দেশে প্রবাহিত ছিল ভু-গর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, যা ৬০ এর দশকের পূর্বে ঢাকা শহরেও ছিল না। মহেনজোদারোর দুর্গটি এলাকাটি ছিল নগরীর পশ্চিম প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণে ১৫০০ ফুট ও পূর্ব পশ্চিমে ৬০০ ফুট বিস্তৃত ভূমির ওপর নির্মিত। দুর্গ এলাকার চর্তুদিক পরিবেষ্ঠিত ছিল। সিন্ধুনদের জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য উক্ত নগরীর বর্হিদেশে বর্তমান যুগের ন্যায় পোড়া ইটের গাঁথুনি এবং সিরামিক ইট দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। বাঁধের উপর ৪০ ফুট তলদেশ থেকে নির্মিত ছিল বিশাল প্রাচীর। প্রাচীরের উপরিভাগের প্রশস্ততা ছিল ৩০ ফুট।

দুর্গের অভ্যন্তরে মাটি ভরাট করে ৩০ ফুট উঁচু ভিটির ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরণের সুউচ্চ প্রসাদরাজী। একটি বিশাল ভবনের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ছিল, পোড়া ইটের গাঁথুনি বিশিষ্ট ও সিড়ি সম্বলিত একটি উন্নতমানের স্নানাগার বা সুইমিং পুল। দুর্গ এলাকা থেকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল নগরীর সাধারণ শস্য ভান্ডার, যাতে ছিল আধুনিক যুগের ন্যায় সাইলো গুদাম ও শস্য শুকানোর উপযোগী সুউচ্চ ভিটি। মোট কথা, আধুনিক কালের যে কোন পরিকল্পিত নগরীর মতই ছিল তার নির্মাণ বৈশিষ্ট্য।

প্রত্নাত্ত্বিকগণের সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সভ্যতার ধারক বাহকরা ছিল একত্ববাদ তথা নিরাকার স্রষ্টায় বিশ্বাসী। কেননা, খনন কার্যের ফলে মহেনজোদারোতে বিস্ময় সৃষ্টিকারী অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেলেও সেখানে কোন ধর্ম মন্দির ও দেব, দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়নি। অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সেখানে মাত্র একটি ষাঁড়ের মূর্তি, নৃত্যরত একটি নারী মূর্তি এবং মানুষ ও পশুর যুগ্ম অবয়ব বিশিষ্ট একটি প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে মাত্র। যার ফলে তৌহিদবাসী জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত বিশাল সভ্যতার মাঝে স্বল্প সংখ্যক গো দেবতা ও পশু পুজারী সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমানকরে। হয়তঃ এই সংখ্যা লঘু পৌত্তলিকেরা কোন স্বজাতীয় বিদেশী শক্তির অদৃশ্য ইঙ্গিত ও স্থানীয় শিখন্ডীদের সহায়তায় সেখানে নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও পৌত্তলিকতার বীজবপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এই উন্নত সভ্যতার ধারক বাহক জনগোষ্ঠির সমাজ জীবনে নেমে এসেছিল চরম ধ্বংস ও আকস্মিক বিপর্যয়।

এরই ফলশ্রুতিতে হয়ত তাদের উপর খোদায়ী গজব হিসেবে আবর্তিত হয়েছিল বিদেশী শক্তির আগ্রাসন। উক্ত বিদেশী আগ্রসনবাদীরা এসে তাদের সভ্যতাকে করে দিয়েছিল চিরতরে নিশ্চিহ্ন। কেউ কেউ অবশ্য হরপ্পা মহেনজোদারোর সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে ধারণা করে থাকেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ এর বিপরীত অর্থাৎ এ সভ্যতাদ্বয় যে

বিদেশী হানাদারদের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল তা অনেকটা নিশ্চিত সত্য।

কিন্তু কারা ছিল এই আগ্রাসনবাদী শক্তি? তাদের পরিচয় জানার জন্য ইতিহাস মন্থন না করে হানাদারদের মুখ থেকেই *শোনা যাক মূল ঘটনা।*

তাদের দাবীমতে উপমহাদেশের আদিতম গ্রন্থ "ঋগ্বেদ" এ তারা স্বীকার করেছেন যে, তাদের পূর্বপুরুষ আর্যরাই নিজেদের যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রের নেতৃত্বে সিন্ধু অববাহিকার এক শত "পুর" বা দুর্গ তথা সুরক্ষিত শহর ধ্বংস করেছিল। এ শহরগুলোর দু'টি ছিল সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত মহানগরী। শারদীয় বন্যা থেকে ছিল সুরক্ষিত। কাঁচা ও পাকা মাটি এবং পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর আবেষ্ঠন মণ্ডিত ছিলো এই সব। এরূপ একশত "পুর" বা শহর ধ্বংস করে তাদের যুদ্ধদেবতা "ইন্দ্র" "পুরন্দর" উপাধিতে ভূষিত হন।

সুতরাং আর্য হিন্দুরাই যে হরপ্পা মহেনজোদারো সভ্যতার ধ্বংসকারী তাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তির পর তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আর্যদের ধ্বংসলীলা থেকে যারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল তারা এসে সিন্ধু পাঞ্জাবসহ অন্যান্য এলাকার স্ব-গোত্রীয় লোকদের সাথে বসবাস শুরু করে।

আর্যদের আদি নিবাস ছিল ইরান অথবা পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলে। জাতি হিসেবে অসভ্য ও যাযাবার হলেও সুসভ্য দ্রাবিড়দের তুলনায় অস্ত্রেশস্ত্রে ছিল অনেক উন্নত। ফলে তারা একের পর এক দ্রাবিড়ীয় অঞ্চলগুলো দখল করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

তখন আমাদের এই বঙ্গদেশ যে মহাশৌর্যবীর্যের অধিকারী শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে খ্যাত ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আত্মীয়তা ও বিশ্বাসগত ঐক্যের সূত্র ধরে আর্যহানাদার কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে এসব অঞ্চলের লোকেরা ব্যাপক হারে আগমন করতে থাকে আমাদের এই বঙ্গদেশে এবং কালক্রমে তারা বাংগালীদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েএকই দেহে লীন হয়ে যায়। ফলে শাব্দিক অর্থেই তারা এক জাতিতে পরিণত হয়ে পড়ে।

উক্ত সম্মিলিত জাতিই পরবর্তীতে গংগরিড়ী বা বংদ্রাবিড়ী নামে খ্যাত।

বর্তমান ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুরা হল আর্যদের উত্তরসূরী। তাতার, ইংরেজ ও য়্যাজুজ-মাজুজ গোষ্ঠির লোকেরাও এই আর্যদের বংশধর বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

মূলতঃ আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা যে ভারত বর্ষে বহিরাগত উপনিবেশবাদী জনগোষ্ঠী প্রকৃত ইতিহাসের আলোকে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অবশ্য আর্য আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে সুসভ্যদ্রাবিড়দের পাশাপাশি দু' একটি অসভ্য যাযাবর উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করতো। আর্য আগমনে এসব বণ্য যাযাবরদের সাথে আর্যদের কৃষ্টি কালচার তথা জীবন যাত্রার মৌলিক সূত্র ধরে তাদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে তা একাকার হয়ে বর্তমান ভারতীয় হিন্দু জনগোষ্ঠির উদ্ভব হয়।

উভয় জনগোষ্ঠির কৃষ্টি কালচার ও রীতিনীতি এক হলেও নবাগত উপনিবেশবাদী আর্য ব্রাহ্মণরা স্থানীয় নিষাদ, কীরাত সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠিকে তাদের সমান মর্যাদা দিতে কিছুতেই সম্মত ছিল না। ফলে তারা এক অভিনব পন্থায় বর্ণ প্রথার সৃষ্টি করে স্থানীয় জনগণকে চিরতরে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে।

এমনকি তারা বাংলাদেশের উপরও তাদের উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও তারা বাংগালীর শৌর্যের সামনে মথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।

সুতরাং বাংগালী জাতি হয়ে পড়ল তাদের আজন্ম শত্রু। বাংগালীর চাল-চলন, আচার-আচরণ, ভাষা-সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচার সব কিছুই তাদের নিকট ঘৃণিত। *সেই থেকে তারা বাংগালী জাতিকে দাস,* দস্যু, যবন, ম্লেচ্ছ, অসুর, সর্প, পক্ষী ইত্যাদি নামে ভূষিত করে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে। এমনকি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও বাংগালী জাতির নিন্দাসূচক বহু বাক্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাই আজও বাংগালী জাতি আর্যব্রহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের নিকট রয়ে গেলে অস্পৃশ্য।

তাদের নিকট বাংগালী জাতির ভাষা হল ইতরের ভাষা এবং পক্ষীর মত কিচির মিচির করা দুর্বোধ্য ভাষা। এ জন্য তারা এ ভাষাকেও অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। এমনকি বাংলা ভাষা চর্চা করাও তাদের নিকট ছিল মহাপাপ। অতএব তারা ঘোষণা দিল কেউ যদি বাংলা ভাষায় কথা বলে তাহলে তার স্থান হবে রৌরব নামক নরকে।

অবশ্য আধুনিক কালের আর্য হিন্দুরা ইংরেজ বাহ্মণ্য চক্রান্তের ফসল ফোর্ট উইলিয়ামী অনুস্বর বিস্বর্গ মিশ্রিত ও সংস্কৃত প্রাধান্য বাংলাকে গ্রহণ করলেও মুসলিম অধ্যুষিত প্রকৃত বাংলা ভাষাকে এখনো দু' চোখের কাঁটা মনে করে থাকে। শুধু হিন্দুরাই কেন তাদের পদলেহী শিখণ্ডি ও তল্পিবাহক কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী তথাকথিত এদেশী সেদেশী প্রগতিশীল শ্রেণীও আজও প্রকৃত বাংলা ভাষাকে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

নিম্নের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, পদলেহী ছোট লোকরা মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার মানুষ ও ভাষা সম্পর্কে কত জঘন্য ধরণের মন্তব্য ও ধারণা পোষণ করে থাকে।

কুখ্যাত লেখক মুরতাদ-শয়তান রুশদী

তার স্যাটানিক ভার্সেস নামক উপন্যাসের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছে, "পূর্ব বাংলায় শুধু বড় বড় জলাশয়। এখানে কারা বাস করে? এই বন্য ও অসভ্য জংলীদের বংশ বৃদ্ধি খুবদ্রুত ঘটে। এরা কোন কাজের নয়। পারে শুধু পাট ফলাতে আর পারে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ, হানাহানি করতে। ধানের শীষের মধ্যে তারা বিশ্বাসঘাতকতার আবাদ করে। এরা আদি বাসী জংলীরজাত। ছোট ছোট, কালো মানুষগুলি, তাদের ভাষা উচ্চারণ যোগ্য নয়, স্বরবর্ণগুলি উদ্ভট ধ্বনিময়।" (দৈনিক সংগ্রাম, ভাষা দিবস সংখ্যা ১৩৯৬)

এতো গেল সেদেশী পদলেহীর দৃষ্টান্ত। এদেশী পদলেহীদের দুঃসাহসও কিন্তু কম নয়। এরা শতকরা ৯৫ জন লোকের ব্যবহৃত মুখের ভাষাকে উপেক্ষা করে তাদের গুরু শ্রী চন্দ্রদের সংস্কৃত প্রাধান্য বাংলাকে দেশবাসীর ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার জন্য সদা তৎপর।

এমনকি এদেশের সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য লালিত সহজবোধ্য ভাষায় কবিতা রচনার অপরাধে তারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সম্প্রদায়িক বলে গালি-গালাজ করতে দ্বিধা করেনি।

তাদের মতে বাংগালী জাতি নাকি লম্পট। আর্য ঋষি দীর্ঘতমা ও অনার্য্যবলী রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার অবৈধ মিলনের ফলে জন্ম প্রাপ্ত জারজ সন্তানেরই বংশধর। বাংগালী জাতির জন্ম সম্পর্কে আর্য হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ পুরান ও মহাভারতে যা' বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলঃ "পূর্ব দেশে বলি নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি একাধারে অজেয় সংগ্রামী, মহাধার্মিক ও প্রন্ডিত ছিলেন। সজাতির বংশজাত বৃদ্ধ ও অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার বিপদকালে তিনি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার জন্য এই অন্ধ ঋষিকে অনুরোধ করেন। দীর্ঘতমা ঋষি নিজ আশ্রয় দাতা বলিরাজার অনুরোধে রানী সুদেষ্ণার সাথে সঙ্গম করে। ফলে রাণীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।

তাদের নাম রাখা হয় অঙ্গ, বংগ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুক্ষ্ম। এই পাঁচটি পুত্রের বংশ থেকে এক একটি দেশ ও জনগোষ্ঠির উদ্ভব ঘটে এবং তাদের নামেই নামরাখা হয় ঐ দেশ ও জনগোষ্ঠির।

সুতরাং বাংগালী জাতি হল দীর্ঘতমা ঋষির জারজ সন্তান বঙ্গেরই বংশধর। অতএব তাদের দৃষ্টিতে বাংগালী জাতি যে অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত তা বলাই বাহুল্য। হায়রে বাঙ্গালী তোমরা কি সত্যই কলঙ্কিত? তোমরা কি তাহলে পরিত্যক্ত লম্পট আর্যঋষি দীর্ঘতমার জারজ সন্তানের উত্তরসূরী?

মুলতঃ এ ঘটনার কোনই ভিত্তি নেই। এটা যে প্রতিহিংসা পরায়ন বর্বর আর্যব্রাহ্মণ্য কুচক্রী মহলের মিথ্যা বানোয়াট, গাজাখোরী উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাল্পনিক উপাখ্যান বৈ আর কিছু নয় এ কথা বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, বাংগালী জাতির মূল উৎপত্তির সাথে আরবজাতির সম্পর্ক ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনি পরবর্তীতেও আবহমান কাল থেকে সে সম্পর্ক হতে থাকে আরো সুদৃঢ় ও গভীরতর। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিয়ে রাজনৈতিক সমাজিক ধর্মীয় এবং সাহিত্য সংস্কৃতি, তাহজীব তমাদ্দুন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বাংগালীদের সাথে আরবীদের জাতীয় পরিচিতিতে শুধু মাত্র শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন ভিন্নতা ছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাস করা যায় না। প্রচলিত ইতিহাসে আরবদের এদেশে আগমন ইসলাম পরবর্তী ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করা হলেও মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আবরদের বাংলায় আগমন বসবাসের ঘটনা সম্পর্কে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্ট পূঃ ৫/৬ হাজার বছর পূর্ব থেকে আরবগণ জাহাজ যোগে চাটগাঁও বন্দর হয়ে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এমন কি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সীতাকুণ্ড ও কামরূপে প্রাপ্ত প্রস্তর যুগের নিদর্শনাবলী থেকে ৮/১০ হাজার বছর পূর্বেই আরব জাতির বাংলাদেশের আগমন ও বসতি স্থাপনের ঘটনা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

১৮৮৬ বুদাপায়া কর্তৃক সীতাকুণ্ডে ভস্মীভূত কাষ্ঠ নির্মিত একটি তরবারী আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষায় ৮/১০ হাজার বছর পূর্বেকার বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই তরবারী যে একমাত্র আরব জনগোষ্ঠির নিদর্শন তা ঐতিহাসিকভাবে সন্দেহাতীত।

আর্য ধর্ম গ্রন্থ এবং আর্য প্রভাবিত ইতিহাসে দেখা যায়, ত্রিপুরা বা 'তিন পুরীতে' প্রথমে দৈত্যগণ বাস করত। এই তিন পুরী হল কমিলা, চট্টলা ও রাশানহ। ঐতিহাসিক কর্ণেল জেরেমীর বর্ণনা মতে এই তিন এলাকা ত্রিপুরা বলে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই তিন এলাকা ছিল আরব অধ্যুষিত। আরবের বিশালকায় শৌর্য্য বীর্যের অধিকারী রণনিপুন মানুষগুলি পার্শ্ববর্তী পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্রকায় অধিবাসীদের নিকট দৈত্য বলেই পরিচিত ছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবরা ছাড়া আর কোন জাতিই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলা ভারতের বুকে বাণিজ্য করতেন না। মূলতঃ গোষ্ঠিগত সম্পর্কের সূত্রে অনিবার্য কারণেই বাংলাদেশে আগমনের সামুদ্রিক পথ জানা থাকা তাদের জন্য অতি স্বাভাবিক ছিল এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য কোন জাতির নিকট তারা সামুদ্রিক যোগাযোগ পথের সন্ধান দিত না।

এজন্য দেখা যায়, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের নিকট এ বাংলা ভারতের অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে অনবহিত।

(২৯ পৃঃ দেখুন)

রুশ কয়েদীদের জবানবন্দীঃ আফগানিস্তানে আমরা কি দেখেছি?

মূল: সুলতান সিদ্দিকী

ড্রাইভারের কাহিনী

উনিশ বছরের বুঝাকভ সবেমাত্র উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। পিতার সাথে কৃষি খামারে চাকুরী নেয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তার সে আশা আর পূর্ণ হলো না। নিজ গ্রাম উকুয়া ত্যাগ করে তিনি তিরমিজ শহরের ফৌজী একাডেমীতে গিয়ে পৌছেন। আওরাল শহরের কুরগানের উপকণ্ঠে ছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর পিতা এক বৃষি খামারে ট্রাক্টরের ড্রাইভার ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মা সংসারের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিতেন।

১৯৮২র জুন মাসে তিনি কুরগানের এক হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। দারিদ্রের কারণে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি। ১৯৮৩ সালে তাঁকে ফৌজী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আহবান জানানো হয়। মাত্র তিন মাসে তিনি ড্রাইভিং শিখে ফেলেন। ভারী ফৌজী গাড়ী চালানোর সাথে সাথে বন্দুক চালানোর দক্ষতাও তিনি অর্জন করেন।

অজানা মন্‌জিল

ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করার পর বুঝাকভকে একটি ভারী ফৌজী হেলিকপ্টারে করে আজানার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেই হেলিকপ্টারে তাঁর মত আরো ৩৬০ জন নওজোয়ান ছিল। হেলিকপ্টারটি আফগানিস্তানে পৌছার পর তাঁরা এর রহস্য বুঝতে পারে। তাঁদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য আগত সিনিয়ার সৈন্যদের থেকে জানতে পারে যে, তারা এখন আফগানিস্তানে অবস্থান করছে। তিন দিন পর বুঝাকভকে উত্তর প্রদেশগুলো থেকে তেল ভর্তি ট্যাংকার দক্ষিণাঞ্চলের কাবুল, বাগরাম ও গরদেজ ইত্যাদি স্থানে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। বুঝাকভ বলেন যে, তেল ও অন্যাণ্য জিনিস পত্র বহনকারী ট্রাকের হেফাজতের জন্য ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ীর খণ্ড খণ্ড কাফেলা সামনে পিছনে প্রহরারত থাকতো। তা সত্ত্বেও অদম্য সাহসী মুজাহিদরা সে সব ট্যাংকার গুলোর উপর হামলা চালাতো। এক সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বুঝাকভ বলেন, তেলবাহী পঞ্চাশটি ট্যাংকার ও আটটি ট্যাংকের এক কাফেলা (যার মধ্যে আমার ট্যাংকারও ছিল) নিয়ে আমরা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলাম। জালালাবাদ ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল। জালালাবাদ থেকে কয়েক কিলো-মিটার দূরে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কে মুজাহিদরা আমাদের বহরের উপর প্রচণ্ড রকেট হামলা চালায়। তাঁদের ফায়ারিং এ ষোলটি ট্যাংকার ও চারটি ট্যাংকে আগুন ধরে যায়। আমার তেলের ট্যাংক চালনীর ন্যায় ঝাঝরা হয়ে যায়। ফলে ফোয়ারার ন্যায় তেল পড়তে শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেলে আগুন ধরেছিল না। কমাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত সামনে অগ্রসর হই। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে জালালাবাদ পৌছে যাই। তথায় পৌছে দেখি যে, আমার ট্যাংকার সম্পূর্ণ খালি, মুজাহিদদের হামলার ফলে সব তেল পড়ে গিয়েছে। গোটা গাড়ী চালনীর ন্যায় ঝাঝরা হয়ে গেলেও ভয়াবহ আগুনের হলকা থেকে রক্ষা পেয়ে আমি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যাই।

সাথীদের সাথে ঝগড়া

রুশ বাহিনী থেকে পালিয়ে আসার মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বুঝাকভ বলেনঃ "আমি এগার মাস যাবত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। এর পর একটি ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং রাশিয়ান ফৌজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক গড়তে উৎসাহিত হই। ঘটনাটি তাঁর জবানীতে শুনুনঃ "অবশেষে আমি তেল নিয়ে বাগরাম পৌছি। গাড়ী খালি করে পরিষ্কার করার জন্য সিনিয়র ড্রাইভারের সাথে নিকটবর্তী একটি নালায় নিয়ে যাই। কিন্তু নালার নিকট পৌছে আমার সাথীদ্বয় কেন যেন প্রথমে তাদের গাড়ী ধুয়ে দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়। আমি এই অযৌক্তিক নির্দেশ মানতে অস্বীকার করায় তারা আমার উপর অতর্কিত ঝাপিয়ে পড়ে। আমি একা আর তাঁরা হলো দু'জন, বয়সেও তাঁরা আমার চেয়ে বড়। ফলে তাঁদের কিল, ঘুষি আর লাথি খেয়ে আমি আহত হই। উপায়ন্তর না দেখে চরম উত্তেজিত হয়ে গাড়ীতে রাখা ক্লাশিনকভ রাইফেল নিয়ে তাঁদের প্রতি গুলি করি। এক পর্যায়ে একজন নিহত ও অপর জন মারাত্মক অবস্থায় মাটিতে তড়পাতে থাকে। এরপর আর বিলম্ব না করে কেউ এসে পড়ার আগেই ফৌজী ক্যাম্পের বিপরীত দিকে পালাতে শুরু করি। দীর্ঘক্ষণ দৌড়ানোর পর এক গ্রামে গিয়ে পৌছি। তখন আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে, সামনে এক কদমও আর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ আমার তখন যায় যায়। বহু কষ্টে একটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পর পাঁচ ছয় বছরের একটি বালকের দেখা পাই। আমাকে দেখে বালকটি ভয় পায়। আমি আলতো ভাবে তাঁর হাত ধরে ইশারায় তাকে বুঝালাম যে, আমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। এবার তাঁর ভয় দূর হলো। আমাকে একটি গাছের নীচে বসতে বলে বালকটি দ্রুত ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সেই সাহসী ছেলেটি কিছু রুটি ও পানি নিয়ে ফিরে আসে। পরম তৃপ্তির সাথে সেই রুটি ও পানি খাওয়ার পর হৃদয়বান ছেলেটি আমাকে তার বাড়ীতে মেহমান হতে বলে। কিন্তু আমি মেহমান না হয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুদূর যাওয়ার পর আমি মুজাহিদদের এক ক্যাম্পে উপস্থিত হই। তথায় কমাণ্ডার মোমেন খান ও তাঁর গ্রুপের মুজাহিদদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমার কাছে ক্লাশিনকভ ও কার্তুসের চারটি মেগজিন ছিল। ওস্তাদ মোমেন খানের হাতে তা হস্তান্তর করে দেই। তিনি খুব খুশী হন। মুজাহিদরা বড় সহানুভূতির সাথে আমার জখমে পট্টি বেঁধে দেয়। কিছুদিন চিকিৎসা নেয়ার পর আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠি।

ভয়ের দিনগুলো

প্রায় এক মাস মোমেন খানের সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থান করার পর মুজাহিদরা আমাকে পাকতিয়ার স্বাধীন এলাকায় স্থানান্তরিত করার মনস্থ করে। মুজাহিদদের সাথে তাদের গাড়ীতে করে পাকতিয়া যাওয়ার সময় পথিমধ্যে রাশিয়ান জঙ্গী বিমানগুলো থেকে প্রচন্ড বোমাবাজী করতে দেখেছিলাম।

আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর সাথে এগার মাসের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করে বুঝাকভ বলেনঃ "দিনগুলো ছিলো খুব ভীতিপ্রদ। ফৌজি অফিসার আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করতো যে, সড়ক পথ বিলকুল নিরাপদ। ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু সব সময়ই কোথাও না কোথাও বন্দুকের আওয়াজ, ট্যাংক ফায়ারের গগণ বিদারী শব্দ শোনা যেত। আর আমরা গাড়িতে বসে ভয়ে জড়সড় হয়ে যেতাম।"

বুঝাকভ আরোও বলেনঃ "সিনিয়ার ড্রাইভাররা একবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করে বসে। কিন্তু পরক্ষণে কমাণ্ডার তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার ভয় দেখালে তাঁরা ক্ষেত্রে যেতে বাধ্য হয়। সেদিন তাঁরা সবাই ক্রোধ ও উত্তেজনার সাথে গাড়ি চালিয়েছিল।" (চলবে)

অনুবাদঃ নোমান আহমাদ

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

সবুজ শ্যামলে ঢাকা ছোট্ট একটি পাহাড়। তার ঠিক পিছনে দাড়িয়ে আছে ঘন গাছ গাছালীর সবুজ চাঁদর ঢাকা আকাশ চুম্বি পর্বতমালা। এর এক প্রান্তে জীর্ণ শীর্ণ একটি বস্তি। বস্তির উত্তর পার্শ্ব দিয়ে একটি পাহাড়ী ঝর্ণা কুল কুল রবে বয়ে চলেছে অবিরাম। ছোট্ট পাহাড়টির সম্মুখ ভাগে বিশাল স্থান জুড়ে গাছ গাছালিতে ভরা জঙ্গল। তার পার্শ্বেই বিরাট চারণ ভূমি। দূর থেকে দেখলে ছোট্ট পাহাড়টিকে অন্যান্য পাহাড় থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে হয় না। পাহাড়ের মাঝে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন উর্বর যমিন। এতে বস্তীবাসীরা ফল—মূলসহ মৌসুমী ফসল আবাদ করে। পাহাড়টির পিছনের অংশে ফেলা হয়েছে বহু তাবু এবং মাটি খুড়ে তৈরী করা হয়েছে বহু মরিচা। এক পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে স্থাপন করা হয়েছে একটি মিমান বিধ্বংসী কামন। আফগানীদের ভাষায় এটিকে দাসাক্কা বলা হয়। এটি পরিচালনার দায়িত্ব টগবগে যৌবন দীপ্ত এক যুবকের ওপর ন্যাস্ত। তার নাম আলী খান। বয়স তের কি চৌদ্দ বছরে বেশী নয়। বয়স কম হলেও শরীরের একহাড়া গড়ন ও বাঁধন দেখে তাকে একজন শক্তিশালী বাহাদুর মুজাহিদের মতই মনে হয়। এইতো এক মাস পূর্বেও সে দুশমনের একটি বিমান ভূপাতিত করেছে। আলী দাসাক্কা ছাড়াও রকেট ল্যানসার চালাতেও বেশ দক্ষ।

আজ থেকে কয়েক বছর আগের কথা। তখন তার প্রিয় মাতৃভূমি ছিলো স্বাধীন। আব্বা-আম্মা ও আদরের ছোট বোন সায়মাসহ সুখ স্বাচ্ছন্দে ভরপুর ছিলো তাদের ছোট সংসার। তাদের সুন্দর বাড়ীটির সামেন ছিল বিরাট একটি ময়দান। লম্বা লম্বা চেলগুজা বেষ্টিত চত্বরটির দুপাশে ছিল সারি সারি আংগুর ও আনার গাছ। গ্রামের অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে ওদের চারণ ভূমি। এর নিকট থেকে প্রাবাহিত ছিলো একটি পাহাড়ী ঝর্ণা। চারণ ভূমির কিছু অংশে ছিলো আনার ও শাহতুতের গাছ। বাকী অংশে আলীর আব্বা গম ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করত। তার পাশদিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাটির স্বচ্ছ-সুন্দর পানি ওই বগানে তার আব্বা সেচ করত।

আলী তখন স্কুলে পড়ে। স্কুল থেকে ফিরে প্রায়ই আবাদী জমিতে পিতার সাথে কাজ করত। গরমের মৌসুমে যে শাহতুত বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে স্কুলের ছবক ইয়াদ করত মনের আনন্দে। তার কোন বন্ধু আসলে গাছ থেকে আনার ও শাহতুত পেড়ে আনন্দের সাথে হাতে তুলে দিত। সে এর চেয়েও আনন্দ পেত গরমের মৌসুমে পাহাড়ের নালাগুলো পানিতে ভরে গেলে তাতে নেমে বন্ধুদেরকে নিয়ে খেলায় মত্ত হওয়ায়।

সায়মা পরিবারের সবার ছোট। তাই সে ছিলো সকলের সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তার নানান রকম দুষ্টুমি সকলে উপভোগ করত।

আলীর একমাত্র ফুফুর বাড়ীটি তাদের গ্রাম থেকে বেশ দূরে। একদিন খুব সকালে ফুফু হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। ফুফুর এমন অবস্থা দেখে সবাই হতবাক। ফুফুর সাথে এসেছে তার সাত বছরের ছেলে খলীল। তাদের সাথে রয়েছে একটি সুন্দর তুল তুলে একটি বকরী। ফুফু আলীর আব্বাকে দেখে বিলাপ করে করুণভাবে কাঁদতে থাকে। আলীর আব্বা অনেক কষ্টে বোনের কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বোন কি হয়েছে তোমার? তোমার গায়ে কেউ হাত তুলেছে? বলো খলীলের আব্বা তোমাকে অপমান করেছে, সে তোমাকে মেরেছে, তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? বল, কেন কাঁদছো তুমি? ফুফু জবাবে বল্লো, না ভাইজান, খলীলের আববা আমাকে মারেনি, ঘর থেকে বের করেও দেয়নি। অত্যাচারী রুশ সৈন্যদের প্রতি ঘৃণায় আমি কাঁদছি। ওরা আমার সবকিছু লুটে নিয়েছে।"

একথা গুলো বলতে তার কণ্ঠ বারবার কেঁপে কেঁপে বন্ধ হয়ে আসছিলো। ফুফু পুনরায় ফুফিয়ে কাঁদতে থাকে। আলীর আব্বা জানতেন, আফগানিস্তানে জালিম রুশদের অনুপ্রবেশের পর নিরিহ আফগান মুসলমানরা পাইকারীভাবে তাদের বর্বরতা, অত্যাচার, ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দেশ ও জনগণের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত-অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে গ্রামেই তাদের অপবিত্র অনুপ্রবেশ ঘটছে সে গ্রামের পুরুষ মহিলা বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে নির্বিবাদে হত্যা করছে, মাটির মাথে গুড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদগুলোকে। তাদের প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভষ্মিভূত হচ্ছে জনপদের পর জনপদ। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে আলীর ফুফু অতপর বল্লেন, "গত সপ্তায় রুশীরা আমাদের গ্রামে হামলা করে। প্রথমে তারা বহু ট্যাংক এবং গাড়ী নিয়ে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। প্রতিটি ঘরে তারা তল্লাশী চালায়। রাইফেল হাতে একদল রুশী ফৌজ আমাদের ঘরে এসে ঢুকে। তল্লাশীর নামে তারা মূল্যবান সব জিনিস হাতিয়ে নেয়। এক নরপিশাচ এগিয়ে আসে আমার গলার চাঁদীর হারটি খোলার জন্যে। আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিলে পিছনের দেওয়ালের সাথে আঘাত খেয়ে নীচে পড়ে যায়। আঘাত সামলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো। খলীলের আব্বা ছুটে এসে যালিমের হাত থেকে ক্লাসিনকভটি ছিনিয়ে নিয়ে তার বুকের ওপর গুলি চালায়। যালিম তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এরমধ্যে অন্যান্য ফৌজ এসে এই অবস্থা দেখে ব্রাশ ফায়ার করে খলীলের আব্বার শরীর ঝাঝরা করে দেয়। খলিলের বড় ভাইকেও ওরা মেরে ফেলেছে।

আমি অত্যন্ত কষ্টের ভিতর দিয়ে এই নর-পশুদের হাত থেকে বেঁচে এসেছি। তাদের ক্লাসিন কভের গুলী কয়েক বার আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে কিন্তু যিন্দেগীর আখেরী লমহা এখনো আসেনি বিধায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বেছে গেছি। শত মসিবতের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌছি। যদি দুধ দেওয়া এ বকরিটি আমাদের সঙ্গী না হত তাহলে হয়তো পথের মধ্যে কোন একস্থানে আমাদের উভয়কে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হতো। আমরা চলে আসতে থাকলে গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে বকরীটি আমাদের পিছু নেয়। পথে পথে এর দুধ পান করে আমরা এ পর্যন্ত এসে পৌছলাম।

খলীলের আম্মার এ অত্যাচারের কাহিনী শুনে সবাই দরুণভাবে ব্যথিত হয়। সকলের চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু ঝড়ে কপোলে প্রবাহিত হয়। আলীর আব্বা বোনকে শান্তনা দিয়ে বলেনঃ "বাহাদুর বোন আমার। সবর করো, এই দেশে আজ 'ক' জন মহিলা আছে যাদের স্বামী ও সন্তানদেরকে ওরা শহীদ করেনি। পুরা আফগান আজ কাঁদছে।"

এ যালিম রুশীরা শুধু আফগানেই নয় রাশিয়ায়ও তারা লক্ষ্য লক্ষ মুলমানদেরকে হত্যা করেছিলো। মসজিদ গুলোকে ওরা মদ্যপানের আড্ডা আর নাচ ঘরে পরিণত করেছে। ভস্ম করেছে ওরা পবিত্র কুরআন আর ধর্মীয় সব কিতাব। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছে ওরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে।"

দিন দিন রুশী ফৌজদের যুলুমে নির্যাতন বেড়েই চলছে। তবে আলীদের গ্রামে ওদের দাজ্জালী অনুপ্রবেশ এখনো ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অত্যাচারের কথা সবার মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

আলীর আববা তার বোনের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। আলীর ছোট্ট বোন সায়েমা এসরেব কিছুই বুঝে না। সমবয়সীদের নিয়ে সে সরাদিন খেলায় মত্তথাকে।

আজকাল খলীলও সায়েমার খেলার সাথী হয়েছে। ওরা দুজন বকরী ও তার বাচ্চাটি নিয়ে পাহাড়ের উপর চরাতে যায়, ছুটোছুটি করে। এভাবে কদিনেই ওরা একে অপরের আপন হয়ে যায়। কখনো বাগানে লুকোচুরি খেলায় আবার কখনো পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে পাথর সাজিয়ে খেলার ঘর তৈরী করে। পরস্পরে ঝগড়া হয়, কিন্তু অল্পক্ষণে মিটমাট করে সব ভুলে খেলায় মনযোগ দেয়।

তাদের এমন পিয়ারী পিয়ারী দুষ্টমী দেখে বাড়ীর সবাই সীমাহীন আনন্দ অনুভব করে। এই কারণে এবং সময়ের ব্যবধানে খলীলের আম্মা নিজের শোক হয়রানীও অনেকটা ভুলে যায় কিন্তু প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর নিজের দেশের আযাদীর জন্য দুআ করতে তিনি কখনো ভুলেন না।

একদিন সায়েমা এবং খলীল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে আসে। হাতে তাদের বকরীর বাচ্চাটি। বাচ্চাটির পুরো গা রক্তে ভেজা। সে রক্তে লাল হয়ে গেছে খলীল ও সায়মার গায়ের জামা। বুঝাই যাচ্ছে, বকরীর বাচ্চাটি আর বেঁচে নেই। বাচ্চাটির নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেছে। বকরীটিও তাদের পিছনে পিছনে চিৎকার করে ছুটে আসছে। বকরীটি ফ্যাল ফ্যাল চোখে সেদিকে তাকাচ্ছিল, জিভ বের করে মুখ চাট ছিলো আর তার মৃত অসাড় বাচ্চাটি দেখছিলো। মনে হয় যেন বকরীটির দু'চোখে প্রচুর অশ্রু এসে জমেছে। বেদনার অশ্রু দু'চোখ উছলে পড়তে চায়। এই অবোধ প্রাণীটির কথা বলার তাকৎ থাকলে অবশ্যই এখন সে চিৎকার করে বলতো, "আমার প্রিয় সাবকটিকে কে কতল করেছে? কি কসুর ছিলো তার? কোন অপরাধে ওর শরীর রক্তাক্ত?" বকরীটি তার স্বভাবসুলভ মায়াবী চোখে কখনো সায়েমা আবার কখনো খলীলের দিকে চাইছে আর যেন বলছে, "তোমরা আমার বাচ্চাটিকে ভীষণ আদর করতে আর সর্বক্ষণ ওকে নিয়ে খেলতে। তোমাদের উপস্থিতিতে আমার এতবড় সর্বনাশটা কেন হতে দিলে তোমরা? তোমরা ওর ব্যাপারে বেখায়াল ছিলে; তোমরা অপরাধি নও কি? এদিকে সায়েমা এবং খলীলও কাঁদছে, কারণ ওরা সত্যিই বাচ্চাটিকে খুব আদর করত। এই সাবকটি ছিলো ওদের খেলার অকৃত্রিম সঙ্গি। খলীলের আম্মা খলীলের কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন; বেটা, বাচ্চাটিকে কে কতল করেছে, চিনো তাকে? খলীল কিছু বলার আগে সায়েমা বল্লো, ঃফুফী জান! বাচ্চাটি আমাদের অদূরেই ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছিলো। আমি আর খলীল ভাইয়া খেলা করছিলাম। হঠাৎ ভীষণ এক আওয়াজ হওয়ায় আমরা উভয়ে ভয় পেয়ে যাই। বকরীটি দৌড়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। আওয়াজ যেদিকে থেকে আসছিল সেদিকে তখন ধুলো বালি উড়ছে। এর রহস্যকি তা দেখতে আমরাও সেই স্থানে পৌছে দেখি যে, বকরীর বাচ্চাটি খুনের মধ্যে ছটফট করছে। কাউকে দেখলাম না, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না যে, কে মারল এই সাবকটিকে। কোন মানুষ আমাদের নযরে পড়েনি।" এবার সকলে পেরেশান হলো এইভেবে যে, তবে কে কতল করলো, কোন কারণে বাচ্চাটির মৃত্যু ঘটল?

গর্ত করে বাচ্চাটিকে মাটি চাপা দেয়ার সময় ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো সায়মা। ওর আব্বা কান্না থামাতে চাইলে জড়ানো গলায় ও বলে, আমি এখন কাকে নিয়ে খেলা করবে। আম্মু! তার আম্মা তাকে প্ররোধ দিয়ে বল্লেন, কেঁদনা, এভাবে কাঁদতে হয় না, বাজার থেকে একটি খুব সূরত বকরীর বাচ্চা তোমকে কিনে দেবো।

খলীল পাশেই দাড়ানো ছিলো, সে বললো, মামিজান, বড় বকরীটি বাচ্চা ছাড়া কি ভাবে একা একা থাকবে? ওর কষ্টের কথা কে বুঝবে? কাকে বলবে হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা?

খলীলের কথা শুনে সায়মার আম্মার চোখে অশ্রু আসে। সন্তান হারার যন্ত্রণার অনুভূতিতে তার দুচোখ বেয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরতে থাকে।

আলী পাশে দাড়িয়ে সবকিছু শুনছিলো এবং অবলোকন করছিলো। আলীকে দেখে বুঝা যায়, গভীরভাবে সে কি যেন ভাবছে। আলী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। হলেও বিচক্ষণ খুবই মেধাবী। সে এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছে কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না যে; এই বিস্ফোরণটি কোথেকে কিভাবে হলো। রুশী ফৌজরা তো এখনো এদিকে আসেনি এবং আকাশে তাদের কোন বিমানও উড়তে দেখা যায়নি। আলী তার আব্বাকেও এ

ব্যাপারে বহু প্রশ্ন করেছে। কিন্তু কোন সমাধান তার আব্বাও দিতে পারেনি। কেউ বিষয়টা আবিষ্কার করতে পারছেন না।

সকলে ঘরেই বসা। হঠাৎ পাথর দিকে লোকজনের শোরগোল শুনে আলীর আব্বা বাইরে বেড়িয়ে দেখেন, একজন আহত যুবককে লোকেরা হাতে হাতে ধরে বাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যুবকটির হাত ও মাথা থেকে অযস্ত্র খুন ঝরছে। আলী ও তার আব্বা আহত যুবকটির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন–কি ঘটেছে তা জানার জন্যে।

কিছুক্ষণ পর যুবকটির হুশ ফিরে আসলে সে জানালো যে, ক্ষেত থেকে বস্তীতে ফেরার পথে রাস্তার উপর একটি সুন্দর ঘরি দেখি। নীচু হয়ে ঘড়িটি তুলতেই বিকট শব্দে তা বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে আমি বেহুশ হয়ে পড়ে যাই। আলী দেখলো, যুককটির তিনটি আঙ্গুলই উড়ে গেছে। কিন্তু কারো মাথায় ঢুকছিলো না যে, ঘড়ির সঙ্গে বিস্ফোরণের সম্পর্কটা কি!

উপস্থিত সকলে যুবককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকলে গো বেচারা অনুযোগের সুরে সে বলে, "আমি তো ঘড়িটি হাতে তুলেছিলাম মাত্র।" একটি ঘড়ি বিস্ফোরিতহয়ে তার হাতের আঙ্গুল উড়িয়ে নিয়েছে এবং তাকে কিভাবে মারাত্মক রকম যখম করেছে তা কেউ বিশ্বাসই করতে পারছে না। এক বৃদ্ধ বললেন, "ঘড়ি হাতে নিলে বিস্ফোরণ ঘটে এমন কথাতো কখনো শুনিনি। সুতরাং এব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, সে কারও সাথে অবশ্যই মারামারি করেছে।

আরেকজন এক ধাপ এগিয়ে বললো, "যদি ঘড়ি হাতে তুললে তা বিস্ফোরিত হয় তাহলে ভদ্রলেকেরা তা পরে কেন?

এমনি ভাবে নানাজন নানা রকম মন্তব্য করে। আস্তে আস্তে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে সবাই পা বাড়ায়। আলী তার আব্বার সাথে বাড়ী ফিরে আসে। সে বিষন্ন চিন্তিত। সে তার আব্বাকে বল্লো, আব্বু নিশ্চয় এর ভিতর কোন রহস্য লুকায়ীত আছে। কেননা এ ব্যক্তি যে ধরণের বিস্ফোরণ যখমী হয়েছে আমাদের বকরীর বাচ্চাটিরও একই ধরণের বিস্ফোরণের কবলে মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং এ বিস্ফোরণ কি ভাবে কোথেকে হয় চিন্তা–ভাবনা করে তার সূত্র খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। একথা শুনে আলীর আব্বা তাকে বললেন, "বেটা যে কথা বড়দেরই বুঝে আসছে না তা নিয়ে তোমার চিন্তা করে লাভ কি? রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলী ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা ভাবনা করেছে কিন্তু কোন কিনারা না পেয়ে কোন এক সময় নিন্দ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

[চলবে]

হাঁপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- গ্যাস্টিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্রাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- স্বপ্ন দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রী ব্যাধি

- শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুলী, ব্রন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিশ্চয়তা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ

হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন–১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)

মিরপুর, ঢাকা–১২১২২

আমরা যাদের উত্তরসূরী

মাওঃ ঈসমাইল হোসেন সিরাজী (রাহঃ)

মোঃ শফিকুল আমীন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্ব চরাচরে তার মনোনীত খলিফা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তার সাথে পাঠিয়েছেন তাদের পার্থিব জীবন চলার পথের যুগোপযোগী জীবন বিধান। যুগে যুগে এই খলিফা তথা নবী রাসুলগণের মাধ্যমে দিশা হারা মানব জাতিকে দিশাদানের মানসে আখেরী পয়গম্বর পর্যন্ত- এ জীবন বিধান পাঠিয়ে হেদায়েতের পথ অব্যাহত রেখেছেন।

আম্বীয়া ও রাসূল যুগ যখন শেষ তখন পরবর্তী প্রজন্মদের জীবন চলায় পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বর্তায় নায়েবে নবী অর্থাৎ নবী প্রতিনিধিগণের ওপর

তাঁরা যুগে যুগে পথ হারা প্রাণ গুলিকে পথ প্রদর্শিত করতে গিয়ে কেউ কেউ অকাতরে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে, কেউবা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আবার কেউ প্রহারের যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারিয়েছেন।

এ রকম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে সকল প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে ইসলামের বিজয় নিশানকে উঁচিয়ে রাখতে যারা সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব

বাংলা ১৩২৬ সনের শীত ঋতুর কোন এক শুক্রবারের ভোর বেলায় সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কামার খন্দ থানার অন্তর্গত পাইকশা গ্রামের মুন্সী জসিম উদ্দিন আখন্দের ঘরে এই প্রতিভার জন্ম।

মুন্সী জসিম উদ্দিন আখন্দ ছিলেন বংশানুক্রমে ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। অত্র এলাকায় ধার্মিক পরিবার হিসেবে মাওলানা ইসমাইলের পরিবার খুবই পরিচিত।

পাঁচ বছর বয়সের সময় শিশু ইসমাইলকে প্রাথমিকশিক্ষার জন্য গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়।। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর পিতা মুন্সী জসিম উদ্দিন বালক ইসমাইলকে প্রখ্যাত তাপস মাওলানা জাবেদ আলী সাহেবের আশ্রয়ে দিয়ে ঐতিহ্যবাহী ডিগ্রীচর মাদ্রাসায় লেখাপড়ার সুযোগ দান করেন। এখানে কিছু দিন শিক্ষালাভের পর চলে যান সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চ শিক্ষার জন্যে চলে যান নোয়াখালী জেলার এক ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষাগ্রহণের পর কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে ফাজিল (জামায়াতে উলা) উত্তীর্ণ হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

মাওলানা ইসমাঈল ছাত্র জীবন থেকে যথেষ্ট মেধার পরিচয় দেন। যে রকম ছিল তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অনুরূপছিল তার বুদ্ধিমত্তা। ছোট বেলা থেকেই সদাচারিতা ও ইসলামী বিধান পালনে তিনি ছিলেন খুবই আন্তরিক।

দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষা জীবন থেকেই তিনি ইসলামী বিভিন্ন সংগঠন ও পীর মাশায়েখের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে কি করে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় সে জন্য সব সময় তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন।

জামাতে উলা উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বীনকে আরও গভীরভাবে জানার মানসে শিক্ষার উচ্চাশিখরে আরোহনের জন্য উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল তাফসীর হাদীস ফিকাহ আকাইদ বিভিন্ন শাস্ত্র উত্তমভাবে অধ্যয়ন করেন এর প্রতিটি বিষয়ে তিনি প্রচুর বুৎপত্তি লাভ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫০ ইং সনে স্বগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সাহেবের বাড়ী সিরাজগঞ্জে হওয়ার কারণে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো তাকেও গোটা উত্তর বঙ্গের লোক সিরাজী সাহেব বলে আখ্যায়িত করতেন, কিন্তু এই দুই মনিষীর জীবনকালের মধ্যে ব্যবধান অর্ধ শতাব্দীর মত।

মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী তৃক্ষ্ণমেধার পরিচয় দিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করে দ্বীনি খেদমত তথা শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তার এ কর্ম জীবন শুরু হয় ইং ১৯৫২ সন পাবনা জেলার এতিহ্যবাহী হাদল সিনিয়ার মাদ্রাসার প্রধান মাওলানার পদে।

অধঃপতিত মুসলিম সমাজ জাতীয় চেতনা হারিয়ে যখন কুসংস্কৃতির মাঝে হাবু ডুবু খাচ্ছিল তখন তিনি শুধু দরস দানকে জাতীয় চেতনার পথ নয় ভেবে কুরআন, হাদীসের ভিত্তিতে সমকালীন ও অনাগতদের জন্য লিখনীরে স্রোতধারা প্রবাহিত করেন। তার এ লিখনীর প্রথম ফসল 'আদর্শ মহানবী"। এই তথ্য বহুল চরিত রচনার পরই তিনি আত্ম-শুদ্ধির জন্য 'রুহানী কিচিৎসা" নামে আরও একখানি মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

হাদলে কয়েক বছর দ্বীনি খেদমতের পর চলে আসেন সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দেস পদে। মাওলানা সিরাজী সাহেবের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত

আকর্ষণীয়, যার ফলে ক্লাশের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে তার নিকট ছাত্রদের ভীড় অব্যহত থাকতো।

এদিকে পাঠদান এবং ইসলামী সাহিত্য রচনার অবসরে সমাজের ধর্মীয় সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে বিভিন্ন দ্বীনি জলসায় বিভিন্ন বিতর্ক সভা, ইসলামী সেমিনার, কনফারেন্স ও বাহাছ মোবাহেসায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করতেন, শুধু তাই নয় দ্বীনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সজাগ ও সক্রিয়।

যেমন নিজ গ্রামের সিনিয়ার মাদ্রাসাটি তিনি ইং ১৯৫৩ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম 'পাইকশা ইসলাম নগর ফাজিল সিনিয়ার মাদ্রাসা"। ইং ১৯৭২ সনে রংপুর সিলমানের পাড়ায় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম 'সিলমানের পাড়া সিরাজুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসা"।

এ প্রতিষ্ঠানটি মাওলানা সিরাজীর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত বলে রংপুরবাসী তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সিরাজী সাহেবের নাম সম্পৃক্ত করে নাম দিয়েছেন "সিরাজুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসা"। এ রকম অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ, কবরস্থান, ইদগাহ তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্বীনি শিক্ষা, ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

সিরাজগঞ্জ শিক্ষকতাবস্থায় তিনি আরও কিছু সমাজ সেবামূলক কাজের আঞ্জাম দেন, যেমনঃ ১৯৬৫ ইং সনের ২৫শে ফাল্গুন রংপুর জেলার কেচড়া গ্রামে মাজহাব পন্থী ও লা মাজহাবীগণের মধ্যে এক বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কথা থাকে যে, যে দল পরাজিত হবে তারা বিজয়ীদলে যোগদিবে। স্থানীয় প্রশাসনের সভা পতিত্বে দুইদিন যাবৎ এ সভা চলে, উভয় দলে ২৫/৩০ জন প্রখ্যাত আলিম যোগ দান করেন। দীর্ঘ সময় সভা চলার পর শেষ মুহূর্তে মাওলানা সিরাজী বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং অর্ধ ঘন্টার মধ্যেই বিপক্ষীয় দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। তার কুরআন হাদীস ভিত্তিক সারগর্ভ তথ্য যুক্তি পূর্ণ ব্যাখ্যায় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতামণ্ডলী মুগ্ধ হন এবং স্থানীয় এলাকায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হয়। এ রকম বাহাছ সভা তার জীবদ্দশায় শতাধিক সংঘটিত হয়েছে এবং অধিকাংশটিতেই তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

ইং ১৯৬৮ সনে পি, টি, আই, ইনিষ্টিটিউট সিরাজগঞ্জে ধর্মীয় শিক্ষক পদে বহাল হন। ঐ সছরই পবিত্র তিনি হজ্জ পালন করে।

অতঃপর ১৯৬৯ ইং সনে দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের প্রত্যয়ে সমগ্র দেশের উলামাগণের সাথে মত বিনিময় করে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন নেজামে ইসলামের সক্রিয় কর্মী। তবে একটি ইসলামী দলের টিকিকে তিনি ১৯৭০ সনে বেলকুচী কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকা হতে কামার খন্দ সীটে প্রাদেশিক সদস্য পদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

এ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো সফলকামে বর্থ হলে সমগ্র দেশের আলিমগণের ওপর নেমে আসে এক বিভিষিকাময় আধাররাত। এ প্রতিকুল পরিবেশে জীবনের ঝুকি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সুগভীর প্রতিতি নিয়ে একটি বছর অতিবাহিত করেন। তারপর ১৯৭২ ইং সনে রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৩ সনে রাজশাহী দারুচ্ছালাম আলীয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দেসের পদ অলংকৃত করেন।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসেমী সাহেব রাজশাহী মহা গরীর বিভিন্ন মসজিদে বাদ জুমা নিয়মিত কুরআন হাদীসের সুনিপুন ব্যাখ্যাদান করতেন। হযরত কাসেমী সাহেবের ইন্তেকালের পর উক্ত দায়িত্ব মাওলানা সিরাজীর উপর অর্পিত হয়। তিনি মৃত্যু অবধি এ দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহীতে কয়েক বছর থাকার পর তিনি চলে যান শেরপুর শহীদিয়া আলীয়ায় প্রধান মুহাদ্দেসের পদে, সেখানে কয়েক বছর দরস দানের পর চলে আসেন নিজ গ্রামের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে।

মাওলানা সিরাজীর নিরলস চেষ্টায় এবং এলাকার তাওহিদী জনতার উদ্দিনপনায় মাদ্রাসাটি কামেল ক্লাশে উত্তীর্ণ হয়। এখানে কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনার পর আবার চলে যান সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বে। মৃতু অবধি তিনি এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। মাওলানা সিরাজীর সংগ্রামী জীবনের দিক ও বিভাগ অনেক, যেমনঃ শিক্ষকতা, দ্বীনি জালসা, বিতর্কানুষ্ঠান, কনফারেন্স, সেমিনার ও বাহাছ মোবাহেরছায় যোগদান, ইসলামী সাহিত্য রচনা, পীর মাশায়েখ ও বুজুর্গগণের দরবারে ময়দান এবং ইলমে মারেফাতের ছবক গ্রহণ ও বিপথু জনতার মাঝে তাছাওফের তালকিন দান ইত্যাদি।

ইসলামী সাহিত্য রচনার মধ্যে তার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থসমুহ যেমনঃ আদর্শ মহানবী, রুহানী চিকিৎসা, তোহফায়ে হজ্জ ও যিয়ারত, হাকিকাতে কালেমায়ে তাইয়েবা, হাকিকাতে তাওহিদ, তালাকের হক মিমাংসা, তারাবিহ, ঈদ ও বেতেরের হকমিমাংসা, সাইফুল মাজাহিব, সিরাজুল উলুম ইত্যাদি।

মাওলানা সিরাজীর রচনাবলির মধ্যে হাকিকাতে তাওহিদ ও সাইফুল মাজাহিব এ দু'টি গ্রন্থ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে। ১৯৮৬ ইং সনে হাকিকাতে তাওহিদ গন্থখানি প্রকাশ করার পর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন তাকে ইসলামি সাহিত্যিক হিসেবে মর্যাদা দিয়ে বিশেষ সরকারী ভাতা মঞ্জুর করেন। শিক্ষকতাবস্থায় সিরাজী সাহেব আলীম ক্লাসের হাদীস গ্রুপের হেড

এক্সামিনার নিযুক্ত হন। তার পর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তক বোখারী শরীফের পরিক্ষক নিযুক্ত হন।

এতগুলি খেদমতের আঞ্জাম দেয়ার পরও ১৯৮৮ সনে ফুরফুরা শরীফের শায়েখ হজরত আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের দ্বিতীয়পুত্র মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী থেকে খেলাফত গ্রহণ করেন। এ খেলাফত নিয়ে যখন তিনি দেশে ফেরেন, তখন দেশবাসী তাকে স্বাগত জানিয়ে তার থেকে পীর প্রদত্ত হবক সমূহ গ্রহণ করতে থাকেন। শিক্ষকতা, গ্রন্থ রচনা, ফতোয়া ফারায়েজ দান এবং পথ হারা জনগণের মাঝে ইলমে মারিফাতের শিক্ষা বিতরণ, সহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের আঞ্জাম দেয়া যে কতটুকু কষ্টসাধ্য তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই অনুমেয়।

জীবনের ঝুকি নিয়ে এতগুলো কাজের আঞ্জাম দিতে দিতে ১৯৯১ ইং সনে তিনি খুব অসুস্ত হয়ে পড়েন। এ কঠিন অবস্থার মধ্যদিয়েই তিনি জীবনের শেষ ইতেকাফ ও শেষ ঈদের সালাতের ইমামতি সম্পন্ন করেন।

এ সময় সিরাজগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বার খোদার দাবীদার একভণ্ড ফকিরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মাওলানা সিরাজী এ খরব জানতে পেরে এলাকা বাসীকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং এর প্রতিবাদে কয়েকটি সভাও করেন। অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় তিনি এক সভায় দীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী তাওহিদের সপক্ষে এবং শিরকের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। এ ছিল মর্দে মুজাহিদের জাতির উদ্দেশ্যে শেষ জ্বালাময়ী ভাষণ। এর কয়েক দিন পরেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯২ ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক বাং ১৩৯৮ ১লা ফাল্গুন রোজ শুক্রবার ভোর বেলায় ৭২ বছর বয়সে এ সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামী সেনা নায়ক, অকুতভয় সিপাহ সালার, নিরলস কর্মবীর, প্রখ্যাত মুহাদ্দেস, হাজার ছাত্র, বন্ধু বান্ধব ও অগণিত ভক্ত বৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়মে জান্নাতের দিকে যাত্রা করেন। ইন্না ..... রাজেউন। তার শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তার হায়াতের অধীর আগ্রহে সময় কাটাচ্ছিলেন। অনেক আলিমগণ বির্তকিত মাসয়ালার ফয়সালার জন্য তার সুস্থতার প্রত্যাশায় কালাতিপাত করছিলেন। তবুও তিনি চলে গেলেন।

তিনি ইন্তেকালের সময় স্ত্রী, চার ছেলে, পাঁচ মেয়ে রেখে যান।

সুখবর! **সুখবর!!** **সুখবর!!!**

ভর্তি চলছে **ভর্তি চলছে** **ভর্তি চলছে**

জামি'আ তাজভীদুল ক্বোরআন (ছাবআ আশারা আন্তর্জাতিক মানের ক্বিরআতের মাদ্রসা) দেশের প্রখ্যাত ক্বারী সাহেবগণের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশে এটাই সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠান। আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ইল্‌মে তাজভীদের মান অনুযায়ী ইল্‌মে তাজভীদ সহ বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করা হয়।

আগ্রহী ছাত্রগণ ১৫ই শাওয়াল জমি'আ খোলার তারিখে যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ

আলহাজ্জ মাওঃ ক্বারী ওবায়দুল্লাহ্
রইছ, জামি'আ তাজভীদুল ক্বোরআন
৩৩/৩৭ গৌর সুন্দর রায় লেন,
চাঁদনী ঘাট (পানির টাংকি সংলগ্ন)
লালবাগ, ঢাকা-১২১১
ফোনঃ ২৫৪১১১

অলস ভোর

মোঃ ইলিয়াছ

আর কত চুপাটি করে
থাকবি ঘরে বসে,
বাতিল পথে পিশাচ যারা
দিচ্ছে ভূবন ধ্বসে।
আর কত দিন ঘুমাবি তুই
ঘুম কি তোর ভাঙ্গবে না,
অবিজিত শুষ্ক ভূমি
খুন দিয়ে কি রাঙাবে না?
সত্য কথা বুক ফুলিয়ে
বলতে কি তোর ভয় লাগে,
বলতো তবে সাগর বুকে
কেমন করে দ্বীপ জাগে?
যেমন বেগে বজ্র নামে
আকাশ বাতাস ফেটে,
তেমন বেগে চলবিরে তুই
পাহাড় গিরী কেটে।
বুলেট-বোমা, কামান-বারুদ
আসুক যতই বুকে
শহীদ হবার স্বপ্ন নিয়ে
লড়বি হাসি মুখে,
খোদার প্রেমে যুদ্ধ মাঠে
যাবিরে তুই ছুটে,
তোদের হাতে জালিম গুলোর
পড়বেরে শির লুটে।
প্রভুর হাতে জীবন মরণ
ভয়কি তবে তোর,
সত্য ন্যায়ের সূর্য জ্বেলে
ভাঙ্গরে অলস ভোর।

আহ্বান

মুহাঃ মুঈনুল ইসলাম সাইয়্যেদপুরী

গাফ্‌লতি নিদ্ ভাঙ্গিয়া আজি
জাগরে নওজোয়ান,
নব পুরাতন শত বাতিল আজ
হইতেছে আগুয়ান।
তুই কেন বীর চুপ করে তবু
ওহে খালিদের দল,
আল্লাহ্‌র নামে তাক্‌বীর দিয়ে
সামনে এগিয়ে চল।
ভয় পাস্ কেন মরলে শহীদ
বাঁচলে তো হবি গাজী,
তুই তো জাতি ভুলে গিয়েছিস্
মনে কি পড়েনা আজি?
ধর্মের তরে লড়তে যারা
পিছু হটেনিকো কভু,
বিজয়ী তাঁদের করেছেন সদা
নিজ অনুগ্রহে প্রভু।
তুই যে উমর, তুই তো আলী
সিন্ধু বিজয়ী কাসিম!
কেটে ফেল যত বাতিলের শির
সাথে রহমত তোর অসীম।
গাফ্‌লতি নিদ ভাঙ্গিয়া আজি
জাগ্‌রে বীর জোয়ান,
নব পুরাতন শত বাতিল আজ
গাইতেছে জয়গান।।

খোদার আইন

মোজাহেরুল ইসলাম

হত যদি সারা বিশ্বে
খোদার আইন জারী,
সত্যিই তবে ঝড়ত ভবে
রহমতেরই বারী।
সুখী হত শান্তি পেত
দেশের জনগণ,
রইত না আর কারো ঘরে,
অভাবঅনটন।

প্রশ্নোত্তর

✪ মাওঃ মুঃ আশরাফ আলী খান জিহাদী, ধুনট, বগুড়া

প্রশ্নঃ *কিভাবে কোন ভঙ্গিতে কথা বলা সুন্নাত বিস্তারিত জানতে চাই।*

উত্তরঃ হযরত হাসান ইবনে আলীর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূল্লাহ (সাঃ) সর্বদা পরকাল ও পরকালের বিষয়াদির চিন্তায় থাকতেন। কোন সময়ই তাঁর স্বস্তি ছিল না। ফলে তিনি অনাবশ্যক কথা-বার্তা বলতেন না। তিনি দীর্ঘ সময় নিশ্চুপ থাকতেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার ও সারগর্ভ কথা বলতেন যাতে শব্দ কম ও সারবত্তা বেশী থাকত।

তিনি কথা বলার সময় ইশারা করলে পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বাম হাতের তালুতে মারতেন। রাগের উদ্রেক হলে তিনি সেই দিক থেকে মুখফিরিয়ে নিতেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। আনন্দের সময় দৃষ্টি নত রাখতেন। (বলা বাহুল্য, লজ্জাই এসবের কারণ।) তার অধিকাংশ হাসি ছিল মুচকি হাসি। এতে যেসব দাঁত দেখা যেত সেগুলো মনে হত বরফের টুকরো। — (নশরুত্তীব, শামায়েলে তিরমিযী)

হহযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাক্যাবলী অত্যন্ত সুস্পষ্ট হত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ তাঁর শব্দাবলী গণনা করতে চাইলে অনায়াসে গণনা করতে পারত। —নশরুত্তীব

হযতর আয়েশা বলেন, রাসুলে করীম (সাঃ) তোমাদের মত বিরতিহীন ও দ্রুততার সাথে কথা বলতেন না; বরং তাঁর কথা পরিস্কার হত। ফলে মজলিসে উপবেশনকারী প্রত্যেকেই সুন্দরভাবে তাঁর কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। —শামায়েলে তিরমিজী

যেসব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা শালীনতা বিরোধী হত। তিনি তা ইংগিতে বলতেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর কথাকে (সাধারণত বক্তৃতার সময় মাঝে মাঝে প্রয়োজনানুযায়ী) তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে শ্রোতারা তা উত্তমরূপে বুঝতে পারে। — শামায়েলে তিরমিযী

কথা বলার ময় তিনি মুচকি হাসতেন এবং অত্যন্ত প্রফুল্ল বদনে কথা বলতেন

যে কোন আলোচনা ও কথা বলার সময় এই সব দিকে লক্ষ রাখা বাঞ্চণীয়। অন্য যে কোন সুন্নাতের চেয়ে এর গুরুত্ব কম নয়। দস্তারখানা বিছিয়ে খানা খাওয়াকে যতটুকু গুরুত্বের সাথে আমরা বিবেচনা করি এই নৈতিক ও চারিত্রিক অনুপম সুন্নাতটিকে আমরা ততটুকুও গুরুত্বের সাথে যে বিবেচনা করি না তা বল্লে অত্যুক্তি হবে না। অথচ এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা একটু ভাবলে বুঝা যায়। অন্যান্য সুন্নাতের সাথে এটিও আমাদের আমলে আনা একান্ত জরুরী।

✪ মোঃ সারওয়ার হোসাইন,
জামেয়া ইসলামিয়া বাহির দিয়া মাদ্রাসা,
বোয়ালমারী,
ফরিদপুর।

প্রশ্নঃ *মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে শাহাদাত বরণ করেন?*

উত্তরঃ পুরুষের মধ্যে হারিস ইবনে আবূ হালাহ (রাঃ) এবং মহিলাদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।

✪ মোঃ আরিফুর ইসলাম
৭২/৮ ঢালকানগর লেন,
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৮।

প্রশ্নঃ *মানুষের শরীরের অংগ যেমন চোখ, কিডনী ইত্যাদি দান করা বা বিক্রি করা জায়িজ কি?*

উত্তরঃ না জায়িয নয়। যেরূপ অন্যের জিনিস কাউকে দান করা বা বিক্রি করা যায় না সেইরূপ চোখ ও কিডনীও কেউ বিক্রি করার অধিকার রাখেনা। কেননা আপনার এই শরীরের মালিক আপনি নন। তাই এর ওপর হস্তক্ষেপ করার আপনি কে?

তবে যদিও কিডনি দানে কারও সাময়িক উপকার লক্ষ করা যায় কিন্তু এই উপকারের চেয়ে অপকারের দিকটি এখনই আশংকাজনক পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে। কেননা এর মধ্যেই জানা গেছে যে, একটি কালোচক্র বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু-কিশোরদেরকে অপহরণ করে তাদের শরীর থেকে মূল্যবান চোখ ও কিডনী বের করে চড়া মূল্যে বিক্রি করছে। চোখ ও কিডনীর ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হলেই কেবল এইরূপ হীন স্বার্থে মানব হত্যার পথ রোধ করা সম্ভব। এই একটি সহ আরও বহু মন্দ দিকের প্রতি লক্ষ করে আমরা বলতে বাধ্য যে, এর উপকারের পরিমাণ থেকে অপকারের পরিমান বহুগুণে বেশী। তাই মানবিক কারণেও এই সবের ক্রয়-বিক্রয় ও দান করার তৎপরতা বন্ধ হওয়া দরকার।

✪ বশির আহমাদ ফারুকী (বিপ্লব)
জেনারেল হাসপাতাল,
টাংগাইল।

প্রশ্নঃ *আমরা অনেকেই আত্মীয়দের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে বড়দের কদম বুচি করি। ইসলামের দৃষ্টিতে কদমবুচি করা জায়িয কি?*

জায়িয হলে কাকে কাকে করা যাবে, সঠিক তথ্য জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ এখনও আমাদের দেশের কিছু লোককে বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এই নিয়মটি পালন করতে দেখা যায়। তবে এই নিয়মটি আমাদের নিজস্ব নয়, হিন্দুদের। হিন্দুদের আশে পাশে থকায় আমরাও কোন কোন পর্যায়ে শিরকসম এই ভাইরাসের আক্রমণের কবলে পতিত। যদি কদমবুচি গ্রহণ করার সময় মাথা সিজদা বা রুকুর সমান ঝুকান হয় তবে তা হারাম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কদমবুচি গ্রহণ করার সময় সাধারণত তাই করা হয়। যদি তা না করা হয় এবং বসে বসে যদি পায়ের ধুলো হাতে তুলে বুকে লাগান হয় তবুও তা নির্দোষ নয়। কেননা বড়দেরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের এইরূপ বিধান ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধ বিরোধী। উপরন্তু এটা মুসলিম সংস্কৃতিও নয়।

ধর্মীয় নিয়ম কানুনের ওপর ভর করে সভ্যতা-সাংস্কৃতি গড়ে উঠে। হিন্দের ধর্মে মানুষ তো দূরের কথা লতা পাতা, পশু-পক্ষীকেও সেজদা করা হয়। হিন্দু সংস্কৃতিতে মাথা ঝুকিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই নিয়ম। যা ইসলামে পরিষ্কার হারম।

কদমবুচি গ্রহণের সময় যেহেতু মাথা ঝুকে যাওয়ার আশংকা থাকে তাই এইরূপ জঘন্য আশংকা থেকে দূরে থকার জন্য এই কদমবুচি নাক হিন্দুয়ানী রোসম পালন থেকে বিরত থাকা।

ইসলাম সমর্থিত সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম হলো, প্রথমে সালাম তারপরে মুসাফাহা ও মোয়ানাকা করা। ইসলামের মৌলিকত্ব বজায় রেখে সম্মান প্রদর্শনের এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কি হতে পারে? সব চেয়ে লক্ষনীয় কথা হলো, কখনও কোন মুসলমান নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে অন্যের আচার আচরণ পালন করতে পারে না। তাই নিজস্ব সংস্কৃতি সভ্যতা ও আচার আচরণের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি চর্চা থেকে বিরত থাকা একান্ত দরকার। এটাকে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করাই বিধান।

✪ মোঃ মাহবুবুর রহমান
ঈশ্বরদী সরকারী কলেজ,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রশ্নঃ *ইসলামের বিজয়ের পূর্বে 'মূলকে হাবশা' (বর্তমান ইরিত্রিয়া)-র রাষ্ট্র প্রধানদেরকে নাজ্জাসী উপাধিতে অবিহিত করা হত। রাসূল্লাহ্ (সাঃ) যে নাজ্জাসীর গায়েবানা জানাজা পড়েছিলেন তাঁর নাম কি ছিলো?*

উত্তরঃ তাঁর নাম ছিলো 'আসমায়াহ'।

✪ মোঃ আঃ রাজ্জাক,
ফুলবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্দা।

প্রশ্নঃ *জনৈক উচ্চ শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী, সমাজে তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি। সূরা কেরাত তার সহিশুদ্ধ, কণ্ঠও ভালো। নামায রোযা নিয়মিত পালন করেন। অথচ ঘুষ খান। মিথ্যা মামলা ফেঁদে সমাজের নিরীহ জনসাধারণকে পুলিশী ধর-পাকড়সহ বিভিন্ন রকম হয়রানীর শিকার করেণ। এমন স্বাভাব সম্পন্ন ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়িজ কি?*

উত্তরঃ ঘুষ খোরের ব্যাপারে হাদীসে কঠোরবানী উচ্চারিত হয়েছে, তাঁকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কেননা ঘুষ খাওয়া হারাম। যে ঘুষ খায় তাকে ফাসিক বলা হয়। আর ফাসিকের ইমামতি মাকরূহে তাহরিম। এমন লোককে ইমাম হিসাবে নিয়োগ করা বৈধ নয়। এমন লোকের পিছনে নামায আদায় করলে তা মাকরূহে তাহরিমীর সাথে আদায় হয়।

✪ মোঃ জামিরুল ইসলাম,
জামাতে মেশকাত শরীফ,
দারুল উলুম মাদ্রাসা,
খুলনা।

প্রশ্নঃ *হযরত ইউসুফ (রাঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) এর জমানার ফেরাউনদের নাম কি?*

উত্তরঃ দ্বিতীয় 'রামাসীস'-এর শাসন কালের সময় মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং তারই ঘরে লালিত পালিত হন। কিন্তু সে অতি বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার ১৫০ জন সন্তানের মধ্যে ত্রয়োদশ সন্তান এবং জেষ্ঠপুত্র 'মিনফাতাহ'কে সে দেশ শাসনের মূলভার অর্পন করে। অতএব মিনফাতাহই হচ্ছে সেই ফেরাউন, যাকে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং যার কাছে বনী ইসরাইলের মুক্তি দাবী করেছিলেন। তার যুগেই বনী ইসরাইলরা মিসর থেকে হিজরত করে ও ফেরাউন সদলবলে নীল নদে ডুবে মারা যায়। সে মূসাকে তার শিশুকাল থেকেই আপন ঘরে প্রতিপালিত হতে দেখিছিল। তাই যখন মূসা (আঃ) তাকে ইসলামের বাণী শুনান তখন সে অবজ্ঞার সুরে বলেছিলোঃ

"আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্তাবধানে লালন পালন করিনি যখন তুমি শিশু ছিলে? আর তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি?". -সূরা শু'আরা, ১৮তম আয়াত।

উল্লেখ্য যে, 'তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, মিসর থেকে বনী ইসরাইলগণ বের হওয়ার পূর্বেই মিসরের বাদশাহর মৃত্যু হয়।"

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নীল নদে ডুবে মরা ফেরাউন

রামাসীস নয় এবং এর পরবর্তী যে শাসক ছিলো সে। আর এর পরবর্তী শাসক হলো 'মিনফাতাহ'। তাই মূসা (আঃ)-এর সাথে বিরোধের মূল নায়ক ছিলো এই 'মিনফাতাহ'। এই লোকই দম্ভভরে বলেছিলো, 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা—আমই তোমাদের বড় খোদা। নাউযুবিল্লাহ। যার শাসনকাল হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ১২৯২ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১২২৫ অব্দ পর্যন্ত। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দ থেকে সিকান্দারের যুগ পর্যন্ত ফেরাউনদের একত্রিশটি বংশ মিসর শাসন করে। সর্বশেষ বংশটি খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে সিকান্দারের হাতে পরাজিত হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সময় কালের ফেরাউনের নাম ছিলো 'হীকসূস'।

✪ মোঃ কাওসার রাব্বী,
মাদ্রাসায়ে ইমদাদিয়া দারুল উলুম,
১২-ডি মিরপুর, ঢাকা-১২২১

প্রশ্নঃ *হযরত বেলাল (রাঃ) কত হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তার সম্বন্ধে জারীগানের ক্যাসেটে যা বলা হয় তা কি সত্য?*

উত্তরঃ হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও মুয়াজ্জিন। তিনি ছিলেন ইসলামে নিবেদিত উঁচুস্তরের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি সিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে চলে যান এবং সিরিয়া বিজিত হলে পর তিন দামেস্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হিজরী ২১ সনে মতান্তরে ২৮ সনে তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ষাট বছর। দামেস্কের নিকটবর্তী দারিয়াতে মতান্তরে আলেপ্পোতে তাঁকে দাফন করা হয়।

এসম্পর্কে জারীগানের ক্যাসেটে কি বলা হয় সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই। বিস্তারিত জানালে পরীক্ষা করে দেখা হবে, ক্যাসেটের তথ্য সঠিক কি সঠিক নয়।

✪ শেখ মোঃ রফিকুল ইসলাম
জামাতে হাফতম, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা,
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কতজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এসেছেন এবং তাদের শাসন কাল কার কতদিন ছিল?*

উত্তরঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১১ জন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এসেছেন। এদের শাসনকাল হল শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১-১২ই জানুয়ারী ১৯৭২ এবং ২৫শে জানুয়ারীঃ ১৯৭৫-১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জানুয়ারী ১২, ১৯৭২-ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৩।

জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ-২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩-২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫।

খন্দকার মোশতাক আহম্মদঃ আগস্ট ১৫, ১৯৭৫-নভেম্বর ৬, ১৯৭৫।

বিচারপতি এ, এম, সায়েম-নভেম্বর ৬, ১৯৭৫-এপ্রিল ২১, ১৯৭৭।

জিয়াউর রহমান ২১শে এপ্রিল ১৯৭৭-৩০শে মে, ১৯৮১।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ৩১শে মে, ১৯৮১-২৩শে মার্চ, ১৯৮২।

বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসান উদ্দিন চৌধুরী, ২৭শে মার্চ, ১৯৮২--১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৪।

হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১১ই জানুয়ারী ১৯৮৪-৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০-৮ই অক্টোবর ১৯৯১।

জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস বর্তমানে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

✪ মোঃ মাহমুদুর রহমান,
খুলনা দারুল মাদ্রাসা,
জামাতে মেশকাত শরীফ,
মুসলমানপাড়া রোড, খুলনা।

প্রশ্নঃ *বর্তমানে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন বৈদেশিক এনজিও তথাকথিত সেবামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। আসলে এদের তৎপরতা তো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার তৎপরতা। প্রশাসন তো এদেরই পক্ষে। তাই এদের বিরুদ্ধে আমাদের কি ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন এবং কিভাবে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মরণ ছোবল থেকে মুসলমানদের ঈমান আকিদাকে রক্ষা করা সম্ভব?*

উত্তরঃ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, যেসব কুচক্রি মহল জনসেবার নামে অন্যের ধর্ম বিশ্বাস ও ঈমান আকীদা ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত তারা মানব সেবার যত বড় আলখেল্লাই পড়ুক না কেন তারা শয়তানের এক নম্বর চেলা। আর এসব শয়তানের চেলাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। ইসলামে মুসলমানদের জান-মাল ও ইমান-আকিদা হেফাজত করার জন্য জিহাদের বিধান রাখা হয়েছে। বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের যেমনি জিহাদ করতে হবে তেমনি ঈমান-আকিদার ওপর হস্তক্ষেপকারী এসব ফেতনা ও কুচক্রী মহলের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক জিহাদ চালাতে হবে। আপনার এলাকার সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান মিলে যদি ধৈর্যের সাথে এ ফিতনার প্রতিরোধ করেন তবে ফিতনা সৃষ্টিকারীরা একসময় তল্পিতল্পা নিয়ে কেটে পড়তে বাধ্য হবে। কেননা শয়তান ও তার অনুসারীরা সর্বদা ভীরু ও দুর্বল।

অন্যায় যে করে ও অন্যায়কারীকে যে প্রশ্রয় দেয় উভয়ই সমান। সুতরাং আমাদের সমাজে আমাদের ঈমান-আকীদাকে লুটে নেয়ার জন্য ঐ সব ফিতনা সৃষ্টিকারীকে যারা প্রশ্রয় দেয় তাদের বিরুদ্ধেও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নবীন মুজাহিদদের পাতা

পরিচালকের চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা! সালাম প্রীতি ও ঈদ শুভেচ্ছা নিবে। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর আবার ঈদ এসেছে। ঈদ তোমাদের জীবনে চীর সুখের বারতা বয়ে আনুক এবং রমযানের শিক্ষা, সাধনা ও কৃচ্ছতা আমাদের জীবনের পাথেয় হোক।

তোমাদের সুখী জীবন কামনায়

পরিচালক ভাইয়া

বলতে পারো?

১। প্রথম ঈদ কত হিজরী উদ্‌যাপিত হয়?

২। আবূ বকর সিদ্দতীক (রাঃ) এর পূর্ণ নাম কি এবং তাকে সিদ্দীকে আক্‌বর কেন বলা হয়?

৩। বদরের যুদ্ধে কত জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন?

৪। হযরত হামজা কোন জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন?

৫। সুদানের বর্তমান রাষ্ট্র প্রধান কে এবং এর রাজধানীর নাম কি?

সঠিক উত্তর

১। দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরজ হয়।

২। "হে মু'মিনগণ, তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য করা হয়েছিল, যেন তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।" –সূরা বাকারা, ১৮৩ তম আয়াত।

৩। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন হিজরতের চার বছর পূর্বে।

৪। ১৫২৮ সনে মোঘল সম্রাট জহির উদ্দীন মুহাম্মাদ বাবরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মীর বাকী সম্রাটের স্মরণে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

৫। উক্ত পংক্তি কয়টির রচয়িতা কবি ফররুখ আহমদ।

একমাত্র সঠিক উত্তরদাতা

আ, ত, ম, ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, প্রযত্নেঃ আশরাফিয়া কুতুবখানা, চৌরাস্তা, যশোহর–৭৪০০

নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম ---------- বয়স ----------

পিতা ---------- শ্রেণী ----------

পূর্ণ ঠিকানা ----------

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অংগীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংগ্রহ করব।

স্বাক্ষর

আপনার চিঠির জবাব

• মোসাঃ সাঈদা সুলতান,
পিতাঃ মাওঃ আবু সাঈদ মোঃ ইসমাঈল,
৫৫/২ চকবাজার,
ঢাকা-১১০০।

এই পত্রিকায় মুদ্রিত নবীন সদস্য কুপন পুরণ করে পাঠালেই কেবল সদস্য হওয়া যায়। ছাপার উপযোগী ছোট গল্প, কবিতা পাঠালে তা অবশ্যই ছেপে দিব। ভালো লেখা কেন ছাপাব না বলুন?

• হাঃ মোঃ আইয়ুব আলী
ইমাম কুচার মহল মসজিদ
শাহ্‌বন্দর, মৌলভী বাজার।

গত অক্টোবর সংখ্যার কিছু পত্রিকা এমন হয়েছিলো বলে আরো অভিযোগ পেয়েছি। বাইন্ডিং-এর পর প্রতিটি পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে প্রতিটি পাতা দেখে বিলি করা কি সম্ভব? এ অনিচ্ছাকৃত কষ্ট ও বিরক্তি লাগার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আরও আগে জানালে ঐ সংখ্যক পত্রিকা আপনার ঠিকানায় অবশ্যই পাঠিয়ে দিতাম। এখন তো অক্টোবর সংখ্যার পত্রিকাও নেই।

বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আপনার অভিযুক্ত অংশ সত্য বটে, তবে এভাবে প্রচার করা ঠিক নয়। বিষয়টা সরমের ও বিরক্তিকর। তাই সরমের বিষয় ঢেকে রাখা চাই। এটাকে সত্যের অপলাপ মনে করা ঠিক নয়।

আপনার অন্যান্য পরামর্শের সাথে আমরা একমত। সম্ভব হলে আপনার পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করব। আপনার অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারে পরিষ্কার করে লিখলে বলা যাবে, আমরা আপনাকে কি বা কতটুকু সহযোগিতা করতে পারি।

সুসংবাদ! **সুসংবাদ!!** **সুসংবাদ!!!**

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াবাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রসা শিক্ষা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বেফাকের প্রাইমারীর সকল বিষয়ের বই পুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এবং শীঘ্রই কওমী পাবলিকেশন্‌স এর মাধ্যমে উহা প্রকাশ ও বাজারজাত করা হচ্ছে-ইন্‌শাল্লাহ্‌।

অতএব সকল মওমী মাদ্রাসায় অত্র বই পুস্তক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যান্য বই পাঠ্য না করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) আবদুল জব্বার
সাধারণ সম্পাদক

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
বাংলাদেশ।

বিঃ দ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্‌স
১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা-১০০০

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা

আফগান দ্বন্দ্বের অবনসান

অবশেষে আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। মুসলিম বিশ্ব আল্লাহ্‌র হাজারো শুকরিয়া আদায় করেছে এই ঘটনায়। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও ইরানের উদ্যোগে ইসলামাবাদে আফগান নেতাদের এক হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনায় এ শান্তি চুক্তির খসড়া প্রণীত হয়। পরে চুক্তির সকল পক্ষ পবিত্র মক্কা শরীফে এ চুক্তিকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। মদীনা শরীফে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বশেষে আফগান নেতারা এ চুক্তি মেনে নেয়ার কসম রেখেছেন। নতুন এ শান্তিচুক্তি অনুযায়ী বুরহানুদ্দিন রাব্বানী আরো ১৮ মাস প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং গুলবুদ্দিন হেকমত ইয়ার হবেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। আফগনিস্তানের বর্তমান সামরিক বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে সর্বদলের মুজাহিদদের সমন্বয়ে নতুন প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের জন্য এ চুক্তিতে বিধান রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে হেকমতইয়ার সহ সকল আফগান নেতারা এ চুক্তিকে মেনে চলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

মিশরের সেকুলার সরকারের হৃৎকম্প শুরু

মিশরের সেকুলার সরকারের বড় দুর্দিন যাচ্ছে। ওদের ভিত এখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। আর এই কাজের কাজটি করেছে জামেয়া ইসলামিয়া নামক একটি ইসলমী সংগঠন। হোসনি মোবারকের সরকার জামেয়া প্রধান শেখ ওমরকে শায়েখ হাসানুল বান্নার চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর বলে মনে করছে। তাই নিরাপত্ত বাহিনী জামেয়ার সদস্যদের ওপর ব্যাপক ধর-পাকর শুরু করেছে। একমাত্র মার্চ মাসের প্রথম দু'সপ্তাহে জামেয়ার ১৬ জন সদস্য নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন। কারাগারে বিচারাধীন আছেন আরও ৮৭ জন, ৫০ জনের বিচার সামরিক আদালতে শুরু হয়েছে। শহীদদের ৯ জনই নিহত হয়েছে আসোয়ান এলাকার আল রহমান মসজিদে। এই এলাকা জামেয়া ইসলামিয়ার শক্ত ঘাটি, মসজিদটিও জামেয়ার নিয়ন্ত্রণে। রাতের বেলায় নামায রত দুইশত মুসল্লির ওপর তল্লাসির নামে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ছুড়লে ঐ ৯ জন শহীদ হয় এবং আহত হয় আরো ৪১ জন। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, এমন নিষ্ঠুরতা ও দমন নির্যাতন চালিয়ে কি কখনও মুসলমান মুজাহিদদের দমিয়ে রাখা যায়। কোনকালে সম্ভব হয়েছে?

ফিলিপাইনে মুজাহিদরা ২৫ জন নৌ সেনাকে পরপারে পাঠিয়েছে

গত ৬ই মার্চ একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার ২৫ জন ফিলিপিনো নৌ সেনাকে হত্যা করার দাবী করেছেন। গোলাম আব্দুল কাদির সাল্লানী নামক এ কমাণ্ডার বাসিলান দ্বীপে এসব নৌ সেনাকে হত্যা করার দাবী করেন। উক্ত কমাণ্ডার ঐ এলাকার সরকারী বাহিনীর জেনারেল গিলাবমো রুইদের নিকট এক চিঠিতে রমযানের পর সরকারী বাহিনীর সাথে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। চিঠিতে জেনারেলকে আরো লিখেন যে, "রমযানের পর আপনার সৈন্যরা আমাদের পাহাড়সমূহে দেখতে পাবে না, আপনার সম্মুখে এবং আশে-পাশে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পাবেন।

ভারত সরকার কাশ্মীরী মুজাহিদদের হুমকিতে কম্পমান

গত ৯ই মার্চ কাশ্মীরের একটি মুজাহিদ সংগঠন কাশ্মীরের সকল স্থানীয় সরকারী আমলাকে ১৫ দিনের মধ্যে পদত্যাগ করার চরমপত্র প্রদান করলে ভারত সরকার ফ্যাসাদে পড়ে যায়। সরকার অবশেষে নমনীয় হয়ে মুজাহিদদের সাথে 'খোলা মনে' আলোচনা করার প্রস্তাব দেয়। 'আল্লাহ টাইগার' নামে মুজাহিদ সংগঠন এ হুমকী প্রদান করেছিল। আগামী ১৮ই মার্চের মধ্যে সকল আমলা পদত্যাগ না করলে তাদের ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হবে বলে হুমকি দেয়ার পরই সরকারের এ নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য ইতোমধ্যে কাশ্মীরের পশু চরিত্রের গভর্ণর গিরিস সাক্সেনা পদত্যাগ করেছেন। তার স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল কৃষ্ণা রাও।

সার্ব বাহিনির বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বহুমুখী পাল্টা অভিযান

বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজ্জতবেগোভে সার্ব পক্ষপাতদুষ্ট ভান্স ওয়েনের শান্তি পরিকল্পনা ও নতুন মানচিত্র প্রত্যাখ্যান করার পর মুসলিম বাহিনী পূর্ব বসনিয়ার অবরোধ কারী সার্ব ইউনিট গুলোর ওপর বহুমুখী পাল্টা অভিযান শুরু করেছে। স্থানীয় সার্ব সামরিক অধিনায়ক সাভেতাজার এ্যান্ডরিক স্বীকার করেন যে, মুসলিম বাহিনী ক্লাদানজ, জিব্রিনিকা, তুজলা ও কলোমিজা থেকে আক্রমণ চালিয়েছে এবং তারা সার্বদের পিছু হটে যেতে বাধ্য করেছে।

গ্রন্থনায়ঃ ফারুক হোসাইন

হাঁপানী, মেদ–ভূঁড়ি ও যৌন রোগসহ পুরুষ ও মহিলাদের যাবতীয় রোগের সু–চিকিৎসা করা হয়

হাঁপানী?

হাঁপানী যে কি কষ্টদায়ক রোগ তা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝতে পারে না। আমরা হাঁপানী, কাশি ও ঠান্ডাজনিত রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা করে থাকি। আপনি যদি হাঁপানী রোগে ভুগে থাকেন তাহলে আমাদের পরামর্শ ও সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।

মেদ–ভূঁড়ি

অতিরিক্ত মেদ–ভূঁড়ি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা। আমরা সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে মেদ–ভূঁড়ি সমস্যার সমাধান করে থাকি। অসংখ্য মেদাক্রান্ত লোকের চিকিৎসা করে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। স্লীম ফিগারের জন্য আপনাকেও জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ।

যৌন রোগে ভুগছেন?

বিয়ের আগে ও পরের দুর্বলতা, যাবতীয় স্বাস্থ্যগত ও যৌন সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের পরামর্শ ও সু–চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ ও মধুময় দাম্পত্য জীবন–যাপন করুন।

বিঃ দ্রঃ– ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পুরাতন আমাশয়, বাত, স্পন্ডিলাইটিস, জন্ডিস, সাইনোসাইটিস, লিউকোরিয়া, মাথার টাক ও চুল পড়াসহ মহিলা ও পুরুষের যাবতীয় জটিল রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা করা হয়।

বিদেশী সহযোগিতায় তৈরী আধুনিক ম্যাসাজ অয়েল

ACO GENITAL

যা আপনার বিশেষ অঙ্গের দুর্বলতাকে দূর করে আরো বেশী সবল ও সুদৃঢ় করবে

আনে শক্তি
আনে সজিবতা

ফাইভ ফ্রুটস্ সিরাপ

বৈজ্ঞানিক ফর্মূলায় প্রস্তুত এবং পেষ্টের সমতুল্য ফেনাযুক্ত

এ্যাকো টুথপাউডার

নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতের যে কোন রোগ নিরাময় করে। দাঁতের গোড়া শক্ত ও মজবুত করে এবং দাঁত ঝকঝকে পরিষ্কার করে।

(মার্কেটিং বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে যোগাযোগ করুন)

সঠিক ও সু–চিকিৎসার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আলম এন্ড কোম্পানী

(হোমিও প্যাথিক ঔষধ আমদানীকারক, বিক্রেতা ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র)

- ১ম শাখাঃ ২, আর,কে, মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩, ফোনঃ ২৫৪১৪৩ (দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনকিলাবের মাঝে)
- ২য় শাখাঃ ৩১১, গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা–১২০৫ ফোনঃ ৫০৯০৯৯ (রূপালী ব্যাংকের পার্শ্বে)

শুক্রবার ও বন্ধের দিনসহ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

রোগী বিবরণী পাঠালে দেশে ও বিদেশে যত্নসহকারে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানোর সুব্যবস্থা আছে।

ইউনিক টেইলার্স

৫০, বায়তুল মোকাররম, ২য় তলা, ঢাকা

অত্যাধুনিক ও
রুচিসম্মত ডিজাইনের
খাঁটি গিনি সোনার
অলংকার
প্রস্তুতকারক
ও বিক্রেতা

ইউনিক জুয়েলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৪৩, বায়তুল মোকাররম (২য়তলা),
ঢাকা—১০০০ ফোন —২৪৩২৭৩

সহযোগী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

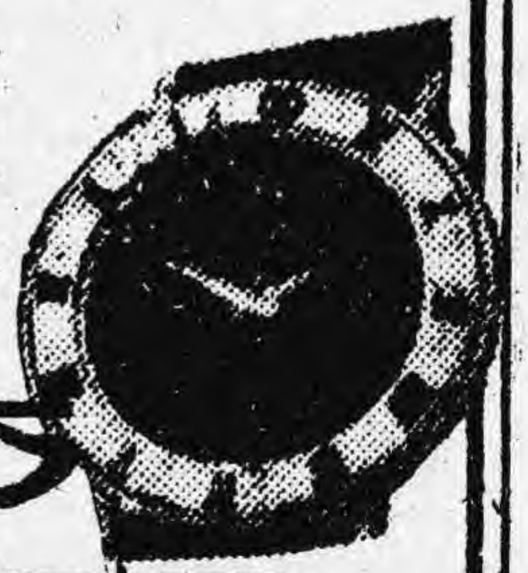

ইউনিক ওয়াচ

সর্বপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়

৩১, বায়তুল মোকাররম (দোতলা), ঢাকা
ফোন ঃ ২৩২৬৮০ বাসা ঃ ৪১৮৩৭৯

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক

Chand
SOCKS

চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা—১২০৪